# ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে মিল ও সাদৃশ্য

ডা. জাকির নায়েক

# ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে মিল ও সাদৃশ্য

(Similarities Between Hinduism and Islam)

জাকির নায়েক বুক সিরিজ-৫

ডা. জাকির নায়েক রচিত

# ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে মিল ও সাদৃশ্য

(Similarities Between Hinduism and Islam)

অনুবাদ

ইফফাত আরা চৌধুরী

দি রিসার্চ ফাউন্ডেশন ফর কুরআন এন্ড সাইন্স
২৪৬ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে মিল ও সাদৃশ্য
ডা. জাকির নায়েক
অনুবাদ : ইফফাত আরা চৌধুরী
ISBN : 984-70012-0001-9

প্রকাশক
এম জি কিবরিয়া
নির্বাহী পরিচালক
দি রিসার্চ ফাউন্ডেশন ফর কুরআন এন্ড সাইন্স
২৪৬ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

প্রাপ্তিস্থান
র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স, ঢাকা
আহসান পাবলিকেশন, কাটাবন, মগবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা
মক্কা পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা
আযাদ বুকস্, চট্টগ্রাম
ইসলামিয়া লাইব্রেরী, রাজশাহী
কোরআন মহল, সিলেট

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট, ২০০৮
দ্বিতীয় প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১০
প্রচ্ছদ : নাসির উদ্দীন
কম্পোজ ও ছাপা
র‍্যাক্স প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
কাটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা)
ঢাকা-১০০০, ফোন : ৮৬২২১৯৫
মূল্য : পঞ্চাশ টাকা মাত্র

**Similarities Between Hinduism and Islam** by **Dr. Zakir Naik** Translated into Bengoli Iffat Ara Chowdhury Published by The Research Foundation for Quarn & Science 246 New Elephant Road, Dhaka-1205 Second Edition October 2010 Price Tk. 50.00 only ($ 2.00)

## প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে ডা. জাকির নায়েক বুক সিরিজের ৫ম খণ্ডটি 'ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে মিল ও সাদৃশ্য' প্রকাশ করার তাওফীক পেলাম। তুলনামূলক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটি খুবই গুরুত্বের দাবিদার। পাঠকবর্গ বিশেষ করে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ছাত্র ও গবেষকদের জন্য এই বইটি খুবই উপকারী হবে বলে আমরা মনে করি।

এ গ্রন্থে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের তুলনামূলক আলোচনায় কোন কোন স্থানে পাঠকের নিকট ইসলামকেও খণ্ডিত অর্থে ধর্ম বলে মনে হতে পারে। আসলে ইসলাম কোন ধর্ম নয়, এটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। দু'টি ধর্মমতের তুলনামূলক আলোচনা করতে গেলে এ ছাড়া আর কোন উপায় থাকেনা বলে পাঠকবর্গ বিষয়টি উদারভাবে দেখবেন বলে আশা করি।

পাঠকের নিকট কোন ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানাবেন, আশা করি পরবর্তী প্রকাশে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে। মহান আল্লাহর নিকট এ কাজের জন্য উত্তম প্রতিদান আশা করছি। আমীন!

# ডা. জাকির নায়েক-এর জীবনী

ডা. জাকির আবদুল করিম নায়েক ১৯৬৫ সনের ১৫ অক্টোবর ভারতের মুম্বাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিবিএস ডিগ্রী অর্জন করেন। পেশায় একজন ডাক্তার হলেও ১৯৯১ সাল থেকে তিনি বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের কাজে একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করেন। ২৬ বছর বয়সে কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিজ্ঞান, গঠনমূলক যুক্তি ও তথ্য-প্রমাণাদির মাধ্যমে তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অমুসলিম ও অসচেতন মুসলিম বিশেষ করে শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্য থেকে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা ও বিশ্বাস দূরীকরণার্থে ভারতের মুম্বাইয়ে তিনি ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন (আইআরএফ) চালু করেন। পরবর্তীতে তাঁরই উদ্যোগে আইআরএফ এডুকেশনাল ট্রাস্ট ও ইসলামিক ডিমেনসন নামক দু'টি সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সিদ্ধ হস্ত। এজন্য আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক– বিশেষতঃ তাদের নিজস্ব টিভি চ্যানেল 'Peace TV', ইন্টারনেট এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে এটি ইসলামের প্রকৃত রূপকে উপস্থাপনে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

ডা. জাকির নায়েক মূলত ইসলামের দা'য়ীর অনন্য দৃষ্টান্ত। ইসলামি রিসার্চ ফাউন্ডেশন গঠন ও তার পরিচালনার কঠিন সংগ্রামের পিছনে তিনিই প্রধান তদারককারী। অবশ্য তাঁর ভাই ডা. মুহাম্মদ নায়েকও তাকে এ কাজে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে আসছেন। আধুনিক ভাবধারার এই পণ্ডিতের ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের তুলনামূলক বিশ্লেষণে জুড়ি নেই। তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে ব্যাপকভাবে অক্ষরে অক্ষরে মহিমান্বিত কুরআন, সহীহ হাদীস ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে তথ্য ও প্রমাণপঞ্জি-পৃষ্ঠা নম্বর, খণ্ড ইত্যাদিসহ উল্লেখ করার কারণে যে কেউ তাঁর বক্তব্য বা প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করুক বা তাঁর এ বক্তব্য শ্রবণ করুক না কেন, সে বিস্মিত ও অভিভূত না হয়ে পারেন না। জনসমক্ষে আলোচনার তীক্ষ্ণতা ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য উত্তর প্রদানের জন্য তিনি সুপ্রসিদ্ধ।

অন্যান্য ধর্মের বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনা (বিতর্ক) ও সংলাপের সময় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় আল্লাহর রহমতে তিনি সফলতার সাথে বিজয়ী হয়েছেন। ২০০০ সালের ১ এপ্রিল আমেরিকার শিকাগো শহরের একটি সম্মেলনে "বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন" বিষয়ে প্রখ্যাত আমেরিকান চিকিৎসক ও খ্রিস্টান ধর্ম

প্রচারক ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল-এর সঙ্গে তার সবচেয়ে বিখ্যাত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল হচ্ছেন সেই লেখক যিনি তিন বছর ধরে গবেষণা করার পর "ইতিহাস এবং বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন ও বাইবেল" (১৯৯২ সালে ১ম সংস্করণ এবং ২০০০ সালে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়) নামক দু'টি গ্রন্থ লিখতে সমর্থ হন; যে বইটিকে তিনি ১৯৭৬ সালে লেখা ডা. মরিস বুকাইলির "বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান" নামক বইটির উত্থাপিত অভিযোগগুলোর খণ্ডনকারী হিসেবে ধারণা করেন। আহমাদ দীদাত ১৯৯৪ সালে ডা. জাকির নায়েককে ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্ম বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত বক্তা হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং ২০০০ সালের মে মাসে দাওয়াহ্ ও অন্যান্য ধর্মের উপর গবেষণার জন্য "হে তরুণ! তুমি যা চার বছরে করেছ, তা করতে আমার চব্বিশ বছর ব্যয় হয়েছে– আলহামদুলিল্লাহি" খোদাই করা একটি স্মারক প্রদান করেন।

ডা. জাকির নায়েক সাধারণত লিখিত কোনো বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন না; বরং সর্বদা জনসমক্ষে বিতর্ক করেন। কারণ, এটা সবার জানা কথা যে, লিখিতভাবে কোনো বিতর্ক করলে তা কখনো শেষ হবার নয়; কিন্তু প্রকাশ্যে বিতর্ক করলে তা কার্যকরীভাবে একটা ফলাফল বয়ে আনে।

আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, সাউথ আফ্রিকা, মৌরিতানিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, হংকং, থাইল্যান্ড, ঘানা (দক্ষিণ আফ্রিকা) সহ আরও অনেক দেশে এ পর্যন্ত নয়শ'র বেশি বার জনসম্মুখে প্রকাশ্য আলোচনায় বিভিন্ন ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম, খৃষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্মের উপর তুলনামূলক বক্তব্য দিয়েছেন। উপরন্তু ভারতেও তিনি অসংখ্য বার বক্তব্য প্রদান করেছেন। যার অধিকাংশ অডিও এবং ভিডিও আকারে এবং ইদানিং বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থাকারে পাওয়া যায়। বিশ্বের একশ'র বেশি দেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টিভি ও স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে ডা. জাকির নায়েককে প্রতিনিয়ত দেখা যায়। বাংলাদেশের ইসলামিক টিভি'র উল্লেখযোগ্য ভূমিকার জন্য ডা. জাকির নায়েক সারা বাংলার ঘরে ঘরে পরিচিত ও প্রিয়মুখ।

ভারতের মিডিয়া ছাড়াও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় রয়েছে তাঁর প্রভাব। ভারতীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা তাঁর অনেক বক্তব্য প্রকাশ করেছে। বাহরাইন ট্রিবিউন, রিয়াদ ডেইলি, গালফ টাইমস, কুয়েত টাইমসহ আরও অন্যান্য সংবাদপত্রে ইংরেজী ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।

## সূচিপত্র

# অনুবাদকের কথা

বিশ্ববরেণ্য ইসলামি চিন্তাবিদ, বাগ্মী ও সুলেখক ডা. জাকির নায়েক রচিত *Similarities between Hinduism and Islam (ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে মিল ও সাদৃশ্য)* বইটি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও আন্তঃধর্ম সংলাপের ক্ষেত্রে এক অনন্য সংযোজন। উভয়ধর্মের মৌলিক উৎস থেকে আহৃত দলিল-প্রমাণ সমৃদ্ধ বইটি ধর্মীয় সম্প্রীতি ও বোঝাপড়ায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম। জটিল বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা বইটি ডা. জাকির নায়েক অনুপম কুশলতার সাথে সুবিন্যস্ত, সহজবোধ্য ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেছেন। এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি বইয়ের বাংলা অনুবাদের দায়িত্ব পেয়ে আমি যেমন উৎফুল্ল হয়েছি তেমনি কিছুটা উদ্বেগও কাজ করছিল। তাই সতর্কতার মাত্রাও ছিল বেশি, যদিও আমি ২০০৩ সাল থেকে একজন পূর্ণকালীন পেশাদার অনুবাদক। এর আগে আমার অভিজ্ঞতা সীমিত ছিল উন্নয়ন, পরিবেশ, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, সংবাদভাষ্যসহ অনুবাদের অন্যান্য শাখায় এবং আমি মূলত বিভিন্ন সংস্থার জন্য ফ্রিল্যান্স কাজ করি।

সত্যি বলতে কি কেবল ইংরেজি ভাষার জ্ঞান দিয়ে এই বই অনুবাদ দুরূহই বটে। সেজন্য অনুবাদের নির্ভুলতার স্বার্থে আমি দ্বিধাহীনভাবে সাহায্য নিয়েছি আরবি ও সংস্কৃত ভাষাবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের, যাদের নিজ নিজ ধর্মতত্ত্ব বিষয়েও রয়েছে অসাধারণ দখল। আমি তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

কুরআনের আয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের *আল-কুরআনুল কারীম*কে প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করেছি, যদিও ইংরেজি ভাষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে কখনো কখনো সামান্য পরিমার্জন করতে হয়েছে। অন্যদিকে বেদ, ভগবদ্‌গীতা, উপনিষদ প্রভৃতি হিন্দুধর্মগ্রন্থগুলোর ক্ষেত্রে এগুলোর বঙ্গানুবাদ থেকে উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে মাঝে মাঝে হোঁচট খেয়েছি। কারণ, ইংরেজি ভাষ্য এবং বাংলা ভাষ্যের শব্দচয়ন ও দ্যোতনা প্রায়ই আমার প্রেক্ষিত ও প্রসঙ্গের সাথে খাপ খাচ্ছিল না। তাই বঙ্গানুবাদ থেকে সাহায্য নিলেও ইংরেজি ভাবকে বজায় রেখে অনুবাদ করেছি। তারপরও বলব, কিছু কিছু ইংরেজি ভাষ্যও অনেক সময় আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকেছে এবং পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে সেসব জায়গায় কিছুটা স্বাধীনতার আশ্রয় নিয়েছি। তবে ধর্মীয় স্পর্শকাতরতার প্রতি সমীহ রেখে অনুবাদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে খুব বেশি স্বাধীনতা নেইনি; যতটা

সম্ভব মূলানুগ থাকার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতা যেন ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি ছিল।

আমাকে যারা সাহায্য করেছেন, তাদের মধ্যে আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই কেশব বসু মল্লিকের কথা, যিনি অনেক সংস্কৃত শব্দ ও হিন্দুধর্ম বিষয়ক পরিভাষার সঠিক প্রতিবর্ণায়ন ও ভাষান্তরে সাহায্য করেছেন। প্রতিবেশী সুতপা নিয়োগীকেও ধন্যবাদ জানাই, যার কাছ থেকে আমি সংগ্রহ করেছি বেদ, মহাভারতসহ অন্যান্য হিন্দুধর্মীয় পুস্তক। আমার স্বামী লুবাইন চৌধুরী মাসুম, যিনি নিজেও একজন বিশিষ্ট অনুবাদক ও দোভাষী, এবং দেবর আব্দুল্লাহ-আল-মামুন যথেষ্ট ধৈর্য নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমগ্র বইটি পড়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেছেন– যা বইয়ের উৎকর্ষ ও প্রাঞ্জলতা বৃদ্ধি করেছে বলে আমার বিশ্বাস। আমাকে বইটি অনুবাদের দায়িত্ব প্রদানের জন্য আহসান পাবলিকেশনের মুহাম্মদ গোলাম ছরওয়ার এবং পথনির্দেশনা দেয়ার জন্য পারিবারিক বন্ধু মোহাম্মদ আলী (সুমন) ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার শাশুড়ি আম্মা এবং ছোট দুই ননদ শিমু ও ফারজানার নামটি এখানে না নিলেই নয়, কারণ আমাদের ছোট্ট সোনামনি আফফানকে তারা সারাদিন আগলে না রাখলে এই বইটির অনুবাদ আরো বিলম্বিত হত।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করে শেষ করছি। অনুবাদ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য বা মতামত থাকলে অনুগ্রহ করে নিচের ঠিকানায় ই-মেইল করতে পারেন।

বিনীত

**ইফফাত আরা চৌধুরী**
ঢাকা, জুলাই ১, ২০০৮
iffatarachowdhury@gmail.com

# ভূমিকা

এই বইয়ে আমরা বিশ্বের প্রধান দু'টি ধর্ম– ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য ও মিল খুঁজে দেখার চেষ্টা করব। এই কাজে আমরা হাত দিয়েছি পবিত্র কুরআনের ৩ নম্বর সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নম্বর আয়াতের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে, যেখানে বলা হয়েছে :

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّ لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

তুমি বল, 'হে কিতাবীগণ!

আস সে কথায়

যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই:

যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত না করি,

কোন কিছুকেই তাহার শরীক না করি

এবং আমাদের কেহ কাহাকেও আল্লাহ্ ব্যতীত

রব হিসাবে গ্রহণ না করে।'

যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়

তবে বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক,

অবশ্যই আমরা মুসলিম (আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণকারী)।'

কোনো ধর্মকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে কিভাবে চেষ্টা করা উচিত সে বিষয়ে আমরা আলোকপাত করব এবং ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরব।

# ১

# কোনো ধর্মকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য করণীয়

## ক. ধর্মানুসারীদের নয়, বরং সেই ধর্মের মূল উৎস দেখুন

হিন্দুধর্ম, খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামসহ বড় বড় ধর্মের অনুসারীরা বিভক্ত হয়ে নিজেদেরকে নানা উপগোষ্ঠীতে ভাগ করে ফেলেছে। সেজন্য কোনো ধর্মকে বুঝতে হলে সেই ধর্মের অনুসারীদের পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করা উপযুক্ত পদ্ধতি নয়। অধিকাংশ ধর্মানুসারীরা নিজেরাই নিজ নিজ ধর্মের সঠিক শিক্ষা কি তা হয়ত জানেন না। সেজন্য কোনো ধর্ম বোঝার সর্বোত্তম ও সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতি হল সেই ধর্মের মূল উৎস অর্থাৎ আসমানি বা পবিত্র গ্রন্থমালা থেকে জানা ও বোঝা।

## খ. ইসলামের মূল উৎস

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনের ৩ নম্বর সূরা আল ইমরানের ১০৩ নম্বর আয়াতে বলেছেন :

وَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوْا.

"তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না"।

এখানে 'আল্লাহর রজ্জু' বলতে পবিত্র কুরআনকে বোঝানো হচ্ছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, মুসলমানদের বিভক্ত হওয়া উচিত নয় এবং তাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টিকারী একমাত্র উপাদান হলো ইসলামের মূল উৎস অর্থাৎ পবিত্র কুরআন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনের ৪ নম্বর সূরা নিসার ৫৯ নম্বর আয়াতসহ কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ.

"হে মুমিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর তাদের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল।"

কুরআনকে ভালোভাবে বুঝতে হলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম [তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক], (যাকে পরবর্তীতে সংক্ষেপে সা. লেখা হবে) কুরআনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটা দেখতে হবে। কারণ আল্লাহ্ তার ওপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। তাই ইসলামকে বোঝার সবচেয়ে উপযুক্ত পন্থা হলো ইসলামের মূল উৎসগুলো অর্থাৎ পবিত্র কুরআন (সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণী) এবং সহীহ্ হাদীস (মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সা.) কথা ও জীবনাচরণ) বোঝা।

### গ. হিন্দুধর্মের মূল উৎস

একইভাবে, হিন্দুধর্ম বোঝার সবচেয়ে ভালো ও উপযুক্ত পন্থা হলো হিন্দুধর্মের মূল উৎসগুলোকে অর্থাৎ হিন্দুধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলো বোঝা। হিন্দুধর্মের সবচেয়ে পবিত্র ও মৌলিক উৎসগুলো হলো বেদ, উপনিষদ, ইতিহাস, ভগবদ্গীতা, পুরাণ, ইত্যাদি।

আসুন আমরা বিশ্বের এই প্রধান দু'টি ধর্মের মৌলিক গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে বিশ্বের প্রধান এ দু'টি ধর্মকে জানি।

### ঘ. এমন মিল ও সাদৃশ্যের ওপর জোর দেয়া যা সাধারণ লোকে জানে না

*ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে মিল ও সাদৃশ্য* নামক বইটিতে আমরা এমন সব সাদৃশ্যের ওপর জোর দেব না যা উভয় ধর্মের সব অনুসারীরাই জানে। যেমন : সদা সত্য কথা বলবে, মিথ্যা বলবে না, চুরি করবে না, দয়ালু হও, নিষ্ঠুর হয়ো না ইত্যাদি। বরং আমরা এমন সব সাদৃশ্যের ওপর জোর দেব যা এ পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে যাদের ভালো ধারণা রয়েছে কেবল তারাই জানেন।

# ২
# ইসলামের পরিচিতি

### ১. ইসলামের সংজ্ঞা

ইসলাম একটি আরবি শব্দ যা سَلْمٌ (সাল্‌ম) এবং سِلْمٌ (সিল্‌ম) শব্দ থেকে এসেছে। سَلْمٌ অর্থ শান্তি এবং سِلْمٌ অর্থ সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করা। সংক্ষেপে ইসলাম অর্থ হচ্ছে আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করার মাধ্যমে শান্তি লাভ করা।

কুরআন ও হাদীসের বহু স্থানে ইসলাম কথাটির উল্লেখ রয়েছে। যেমন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯ এবং ৮৫।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامِ.

অর্থ : "নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর নিকট মনোনিত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা"।

### ২. মুসলিমের সংজ্ঞা

সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে যে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে সে-ই মুসলিম। কুরআন ও হাদীসের বহু স্থানে মুসলিম কথাটির উল্লেখ রয়েছে। যেমন : সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৬৪ এবং সূরা ফুস্‌সিলাত, আয়াত ৩৩।

فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

অর্থ : "তোমরা সাক্ষী থাক নিশ্চয়ই আমরা মুসলমান"।

### ৩. ইসলাম সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা

অনেকেরই একটি ভুল ধারণা রয়েছে যে ইসলাম একটি নতুন ধর্ম যা এসেছে ১৪০০ বছর আগে এবং যার প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। আমি এখানে স্পষ্ট করে বলতে চাই যে ইসলাম কোনো নতুন ধর্মের নাম নয়, যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন এবং এই যুক্তিতে মহানবী হযরত মুহাম্মদকে (সা.) ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায় না।

কুরআনের বর্ণনা মতে, আল্লাহ্ ইসলামকে (মানুষের একমাত্র সৃষ্টিকর্তার কাছে

পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ) একমাত্র ধর্মবিশ্বাস ও জীবনবিধান হিসেবে সৃষ্টির শুরু থেকেই মানবজাতির কাছে প্রেরণ করেছেন। হযরত নূহ (আ.), হযরত সুলাইমান (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত ইসহাক (আ.), হযরত মুসা (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)-সহ যেসব নবী-রাসূলগণ বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে আগমন করেছেন তারা সকলেই একই বিশ্বাস এবং বাণী প্রচার করেছেন, যার মধ্যে আছে তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ), রিসালাত (নবুওয়ত) এবং আখিরাত (মৃত্যুর পরের জীবন)। আল্লাহর এসকল নবী-রাসূলগণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের প্রবর্তক নন। তারা প্রত্যেকেই তাদের পূর্বসূরিদের বাণী ও বিশ্বাস প্রচার করেছেন।

যাহোক, মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন আল্লাহর শেষ নবী ও রাসূল। আল্লাহর সব রাসূলগণ যে সত্য দ্বীন প্রচার করেছেন সেই একই দ্বীনকে আল্লাহ তার মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। এই সত্যবাণীকে বিভিন্ন যুগের মানুষ বিকৃত করে। এতে বাইরের বাণী আরোপ করে এবং এতে অন্যকথার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সত্য দ্বীনকে নানা ধর্মে বিভক্ত করা হয়। আল্লাহ এসব বাইরের উপাদান নির্মূল করেন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সা.) মাধ্যমে ইসলামকে এর বিশুদ্ধ ও প্রকৃতরূপে মানবজাতির নিকট প্রেরণ করেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সা.) পর যেহেতু আর কোন নবী আসবেন না, তাই তার নিকট প্রেরিত গ্রন্থটির প্রতিটি শব্দ সংরক্ষণ করা হয় যাতে তা সবযুগে হেদায়েত বা পথনির্দেশিকার উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তাই সব নবীদের দ্বীনই ছিল 'আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ', আর আরবি ভাষায় একে বোঝানোর জন্য একটি শব্দই রয়েছে তা হলো 'ইসলাম'। হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ঈসাও (আ.) (যিশুখ্রিস্ট) যে মুসলমান ছিলেন পবিত্র কুরআনের সূরা আল ইমরানের ৫২ এবং ৬৭ নম্বর আয়াতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ط قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ج اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ج وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

অর্থ : অতপর যখন ঈসা (আ.) তাদের মধ্যে কুফুরীর ব্যাপারে অবগত হলেন

তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে কারা আল্লাহর জন্য সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীরা বলল, আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী হব। আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করেছি। সাক্ষী থেক যে, নিশ্চয়ই আমরা মুসলমান"।

مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًا وَّلاَ نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

অর্থ : "ইবরাহীম (আ.) ইহুদী বা নাসারা ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলমান। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না"

# ৩
# হিন্দুধর্ম পরিচিতি

## ১. একজন হিন্দুর পরিচয়

ক. হিন্দু শব্দটির ভৌগোলিক তাৎপর্য রয়েছে। সিন্ধু নদের তীরবর্তী এলাকার অধিবাসী বা সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চল বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হত।

খ. ইতিহাসবিদগণ বলেন, হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশকারী পারস্যবাসীরাই প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন। আরবরাও হিন্দু শব্দটি ব্যবহার করতেন।

গ. *এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিওনস এন্ড এথিক্স* ৬:৬৯০ অনুসারে ভারতে মুসলমান আগমনের আগে ভারতীয় সাহিত্য বা হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোর কোথাও 'হিন্দু' শব্দটির উল্লেখ ছিল না।

ঘ. জওহরলাল নেহ্রু তার *ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া* বইটির ৭৪-৭৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন অষ্টাদশ শতকে সংস্কৃত ভাষায় হিন্দু শব্দের উল্লেখ দেখা যায়, যেখানে এই শব্দ দিয়ে একটি জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে, কোন বিশেষ ধর্মের অনুসারীকে নয়। 'হিন্দু' শব্দটি দিয়ে কোন বিশেষ ধর্মকে বোঝানোর বিষয়টি আরো পরে ঘটে।

ঙ. সংক্ষেপে বলতে গেলে হিন্দু হলো একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা বা শব্দ যা দিয়ে সিন্ধু নদের তীরে বসবাসকারী মানুষদের তথা ভারতবর্ষে বসবাসকারী মানুষদের বোঝানো হত।

## ২. হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা

ক. হিন্দু শব্দটি থেকে হিন্দুধর্ম শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে। *নিউ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা* ২০:৫৮১ অনুসারে উনিশ শতকে ইংরেজি ভাষায় হিন্দু শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়, যা দিয়ে ইংরেজরা সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলের মানুষের বিভিন্ন ধর্ম

বিশ্বাসকে বোঝাতো। ১৮৩০ সালে ইংরেজ লেখকরা মুসলমান ও খ্রিস্টান ছাড়া ভারতবর্ষের সকল ধর্মবিশ্বাসের মানুষকে বোঝাতে হিন্দুধর্ম বা হিন্দুত্ববাদ শব্দটি ব্যবহার করে।

খ. হিন্দু পণ্ডিতদের মতে, হিন্দুধর্ম বা হিন্দুত্ববাদ মূলত নামের ভুল প্রয়োগ। তাদের মতে, 'হিন্দুধর্ম'-কে বলা উচিত 'সনাতন ধর্ম' যার অর্থ চিরন্তন ধর্ম, অথবা 'বৈদিক ধর্ম' যার অর্থ বেদের ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, এই ধর্মের অনুসারীদের 'বেদানুসারী' বলে পরিচয় দেওয়া উচিত।

এখন আমরা ইসলামের স্তম্ভগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব এবং হিন্দুধর্ম গ্রন্থে উল্লেখিত হিন্দুধর্মের মূল বিশ্বাসগুলোর সাথে এগুলোকে তুলনা করব। ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সৃষ্টিকর্তার ধারণাও আমরা অধ্যয়ন ও তুলনা করব।

## ইসলামের মূল বিশ্বাস (ঈমান) এবং হিন্দুধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত মূল বিশ্বাসের সাথে তার তুলনা

পবিত্র কুরআনের ২ নম্বর সূরা আল বাকারার ১৭৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ.

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোন পুণ্য নাই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ্ এবং পরকাল এবং ফিরিশতাগণ এবং সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করিলে"।

সহীহ মুসলিম প্রথম খণ্ড, ঈমান সম্পর্কিত পাঠ, অধ্যায় ২, হাদীস নম্বর ৬।

সহীহ মুসলিমে বলা হয়েছে যে :

"...রাসূলের কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রাসূল, ঈমান কি? তিনি (নবীজী) বললেন, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ, তাঁর রাসূলগণ এবং পুনরুত্থান অর্থাৎ পরকাল এবং কদর বা ভাগ্যে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে।"

সুতরাং ইসলামে ঈমানের ছয়টি মূলনীতি হলঃ

১) আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা (ইসলামে ঈমানের বা বিশ্বাসের প্রথম মূলনীতি হলো 'তাওহীদ' অর্থাৎ সকল সৃষ্টির এক অদ্বিতীয় চিরঞ্জীব সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা);

২) তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা;

৩) তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা;

৪) তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা;

৫) পরকাল অর্থাৎ মৃত্যুর পরের জীবনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা; ও

৬) কদর অর্থাৎ ভাগ্যে বিশ্বাস স্থাপন করা।

আসুন আমরা এই দু'টি প্রধান ধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে এই দু'টি প্রধান ধর্মে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে যে ধারণা রয়েছে তা বিশ্লেষণ করি এবং তাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য রয়েছে কিনা তা দেখি।

প্রথমে আমরা হিন্দুধর্মে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে যে ধারণা রয়েছে তা আলোচনা করব।

# ৪

# হিন্দুধর্মে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ধারণা

আপনি যদি সাধারণ হিন্দুদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তাদের কতজন দেবতা রয়েছে, তাহলে তাদের কেউ কেউ হয়ত বলবে তিনজন, কেউ বলবে ৩৩ জন, কেউ বলবে এক হাজার আবার কেউ কেউ হয়ত বলবে ৩৩ কোটি। কিন্তু আপনি যদি কোন হিন্দু পণ্ডিতকে এই প্রশ্ন করেন যার হিন্দুধর্ম গ্রন্থ সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি রয়েছে, তাহলে তিনি বলবেন, হিন্দুদের একজন দেবতায় বিশ্বাস করা উচিত এবং তারই উপাসনা করা উচিত।

**ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে পার্থক্য হলো একটি 'র'-এর**

*(সবকিছুই 'স্রষ্টার' [আল্লাহর] বনাম সবকিছুই 'স্রষ্টা' [ভগবান বা ঈশ্বর])*

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো সাধারণ হিন্দুরা সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাস করে অর্থাৎ "সবকিছুই ঈশ্বর/ভগবান। বৃক্ষ ঈশ্বর, সূর্য ঈশ্বর, চন্দ্র ঈশ্বর, সর্প ঈশ্বর, বানর ঈশ্বর, মানুষ ঈশ্বর"।

অন্যদিকে মুসলমানেরা বিশ্বাস করে যে "সবকিছুই ঈশ্বরের বা ভগবানের [আল্লাহর]।" অর্থাৎ বাংলা বর্ণ 'র' সংযুক্ত করতে হবে। সবকিছুরই মালিক এক অদ্বিতীয় চিরঞ্জীব আল্লাহ। বৃক্ষ-তরুলতার মালিক আল্লাহ্, সূর্যের মালিক আল্লাহ্, চন্দ্রের মালিক আল্লাহ্, সর্পের মালিক আল্লাহ্, মানুষের মালিক আল্লাহ্

সুতরাং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মূল পার্থক্য হল একটি 'র'-এর। হিন্দুরা বলে সবকিছুই 'ঈশ্বর [ভগবান]' আর মুসলমানেরা বলে সবকিছুই 'ঈশ্বরের [আল্লাহর]'। যদি আমরা এই 'র'-এর পার্থক্য ঘোচাতে পারি তাহলে হিন্দু ও মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হবে।

পবিত্র কুরআনের ৩ নম্বর সূরা আল ইমরানের ৬৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ الاَّ اللّٰهَ.

"আস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই"।

**কোনটি প্রথম কথা?**

" আল্লাহ্ ছাড়া আমরা আর কারোরই উপাসনা করব না"

সুতরাং আসুন আমরা হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থগুলো বিশ্লেষণের আলোকে ঐক্যমতে পৌঁছি।

**উপনিষদ**

উপনিষদ হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি।

১. ছান্দোগ্য উপনিষদ অধ্যায় ৬, সেকশন ২, শ্লোক ১।

" ইকাম ইভানদ্বিতীয়াম"

তিনি এক, যার কোনো দ্বিতীয় নেই।

(এস. রাধাকৃষ্ণ রচিত প্রধান উপনিষদ, পৃষ্ঠা ৪৪৭ এবং ৪৪৮) (স্যাক্রিড বুকস অব দি ইস্ট, খণ্ড ১, উপনিষদ পর্ব ১, পৃষ্ঠা ৯৩)

২. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, অধ্যায় ৬, শ্লোক ৯

"তার কোনো পিতামাতা নেই বা প্রভু নেই।"

(এস. রাধাকৃষ্ণ রচিত প্রধান উপনিষদ, পৃষ্ঠা ৭৪৫) (স্যাক্রিড বুকস অব দি ইস্ট, খণ্ড ১৫, উপনিষদ পর্ব ২, পৃষ্ঠা ২৬৩)

৩. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, অধ্যায় ৪, শ্লোক ১৯

"ন তস্য প্রতিমা আস্তি"

তার মত কেউ নেই।

(এস. রাধাকৃষ্ণ রচিত প্রধান উপনিষদ, পৃষ্ঠা ৭৩৬ এবং ৭৩৭) (স্যাক্রিড বুকস অব দি ইস্ট, খণ্ড ১৫, উপনিষদ, পর্ব ২, পৃষ্ঠা ২৫৩)

৪. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, অধ্যায় ৪, শ্লোক ২০

"তার আকৃতি দেখা যায় না, কেউ তাকে চোখে দেখতে পায় না।"

(এস. রাধাকৃষ্ণ সম্পাদিত/অনূদিত প্রধান উপনিষদ, পৃষ্ঠা ৭৩৭) (স্যাক্রিড বুকস অব দি ইস্ট, খণ্ড ১৫, উপনিষদ পর্ব ২, পৃষ্ঠা ২৫৩)

**ভগবদ্গীতা**

হিন্দুধর্ম গ্রন্থগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল ভগবদ্গীতা।

ভগবদ্গীতায় ৭:২০ উল্লেখ আছে:

"জাগতিক আকাঙ্ক্ষা যাদের জ্ঞানবুদ্ধিকে চুরি করেছে তারাই মানুষের গড়া স্রষ্টার পূজা করে"। অর্থাৎ "যারা বস্তুবাদী, তারাই মানুষের গড়া স্রষ্টা অর্থাৎ সত্য সৃষ্টিকর্তাকে ব্যতীত অন্যান্য দেবদেবীর পূজা করে"।

ভগবদ্গীতায় ১০:৩ উল্লেখ আছে,
" তিনিই সে যে আমাকে জানেন অজাত, অনাদি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে।"

**যজুর্বেদ**

সকল হিন্দুধর্ম গ্রন্থগুলোর মধ্যে বেদকে সবচেয়ে পবিত্র বলে গণ্য করা হয়। বেদকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা হয়: ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ।

১. যজুর্বেদ, অধ্যায় ৩২, শ্লোক ৩

"ন তস্য প্রতিমা আস্তি"

তার কোনো প্রতিকৃতি নেই।

এতে আরো বলা হয়েছে,
তিনি অজাত, তিনি আমাদের উপাসনা পাবার যোগ্য। (যজুর্বেদ ৩২:৩)
(দেবি চাঁদ এম.এ. সম্পাদিত যজুর্বেদ, পৃষ্ঠা ৩৭৭)

২. যজুর্বেদ, অধ্যায় ৪০, শ্লোক ৮

"তিনি কায়াহীন ও বিশুদ্ধ"

(রালফ টি. এইচ. গ্রিফিথ সম্পাদিত যজুর্বেদ সংহিতা, পৃষ্ঠা ৫৩৮)

৩. যজুর্বেদ, অধ্যায় ৪০, শ্লোক ৯

"অন্ধতম্ প্রবিশান্তি ইয়ে অসমভূতি মুনাস্তে"

"তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে, যারা প্রাকৃতিক বস্তু পূজা করে।"

প্রাকৃতিক বস্তু যথা, বায়ু, পানি, অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি।

এতে আরো বলা হয়: "যারা সম্ভূতি অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তুর যথা, টেবিল, চেয়ার, মূর্তি প্রভৃতির পূজা করে, তারা অন্ধকারের আরো বেশি গভীরে ডুবে যায়।"
(রালফ টি. এইচ. গ্রিফিথ সম্পাদিত যজুর্বেদ সংহিতা, পৃষ্ঠা ৫৩৮)

**অথর্ববেদ**

**১. অথর্ববেদ, বই ২০, স্তবক (অধ্যায়) ৫৮, শ্লোক ৩.**

"দেব মহা ওসি"

"নিশ্চয় ভগবান মহান"

(উইলিয়াম ডুয়াইট হোয়াটনি সম্পাদিত অথর্ববেদ সংহিতা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯১০)

**ঋগ্বেদ**

**১. ঋগ্বেদ, বই ১, স্তবক ১৬৪, শ্লোক ৪৬.**

"ইকাম সাত বিপরা বহুধা বদান্তি"

"জ্ঞানী পুরোহিতরা এক ঈশ্বরকে বহু নামে ডাকেন"।

সত্য এক, ঈশ্বর এক, জ্ঞানী পুরোহিতরা তাঁকে নানা নামে ডাকেন। একই ধরনের বার্তা পাওয়া যায় ঋগ্বেদ, বই ১০, স্তবক ১১৪, শ্লোক ৫।

**২. ঋগ্বেদ, বই ২, স্তবক ১**

ঋগ্বেদে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকে অন্তত ৩৩টি গুণাবলিতে ভূষিত করা হয়েছে। এসব গুণাবলির বেশ কয়েকটি ঋগ্বেদ, বই ২, স্তবক ১-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

**ক. ব্রহ্মা = সৃষ্টিকর্তা = খালিক : ঋগ্বেদ বই ২, স্তবক ১, শ্লোক ৩**

ঋগ্বেদে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার যেসব গুণাবলি দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম সুন্দর অভিধা হল ব্রহ্মা। ব্রহ্মা শব্দের অর্থ হল সৃষ্টিকর্তা। আপনি যদি একে আরবিতে অনুবাদ করেন, তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে খালিক। কেউ যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহকে খালিক বা সৃষ্টিকর্তা বা ব্রহ্মা বলে ডাকেন, তাহলে ইসলাম এতে কোনো আপত্তি জানাবে না। কিন্তু কেউ যদি বলেন যে বহ্মা অর্থাৎ সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার চারটি মাথা আছে, যার প্রতিটিতে মুকুট আছে এবং এই ব্রহ্মার চারটি হাত আছে– তাহলে ইসলাম এতে প্রবল আপত্তি জানাবে। কারণ এধরনের বর্ণনা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার আকৃতি তুলে ধরে। এধরনের বর্ণনা যজুর্বেদের অধ্যায় ৩২, শ্লোক ৩-উল্লিখিত বর্ণনারও পরিপন্থী, যেখানে বলা হয়েছেঃ

"ন তস্য প্রতিমা আস্তি"

তার কোনো প্রতিকৃতি নেই।

**খ. বিষ্ণু = পালনকর্তা = রব : ঋগ্বেদ বই ২, স্তবক ১, শ্লোক ৩**

ঋগ্বেদ বই ২, স্তবক ১, শ্লোক ৩-এ উল্লিখিত আরেকটি সুন্দর অভিধা হল বিষ্ণু। বিষ্ণু অর্থ হল পালনকর্তা/প্রতিপালক। আপনি এই শব্দকে আরবিতে অনুবাদ করলে এর অর্থ দাঁড়ায় রব। কেউ যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহকে রব বা পালনকর্তা/প্রতিপালক বা বিষ্ণু বলে ডাকেন, তাহলে ইসলাম এতে কোনো আপত্তি জানাবে না। কিন্তু কেউ যদি বলেন বিষ্ণু সর্বশক্তিমান আল্লাহ, যার চারটি হাত আছে এবং তাঁর ডান হাতে ধরা আছে চক্র বা চাকা এবং বাম হাতে রয়েছে শঙ্খ। বিষ্ণু পক্ষীতে বিহার করেন এবং সর্পাসনে বিশ্রাম করেন। তাহলে ইসলাম এতে প্রবল আপত্তি জানাবে। কারণ বিষ্ণুর এধরনের বর্ণনা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার আকৃতি তুলে ধরে। এধরনের বর্ণনা যজুর্বেদের অধ্যায় ৪০, শ্লোক ৮-উল্লিখিত শিক্ষারও পরিপন্থী।

৩. ঋগ্বেদ, বই ৮, স্তবক ১, শ্লোক ১

"তিনি, পূত-পবিত্র, তিনি ব্যতীত আর কারো উপাসনা করো না, শুধু তাঁর স্তুতি করো।"
(স্বামী সত্যপ্রকাশ সরস্বতি এবং সত্যকাম বিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত ঋগ্বেদ সংহিতা, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ১ ও ২)

৪. ঋগ্বেদ, বই ৫, স্তবক ৮১, শ্লোক ১

"পূত-পবিত্র সৃষ্টিকর্তার মহত্ত্ব নিশ্চয়ই মহান।"
(স্বামী সত্যপ্রকাশ সরস্বতি এবং সত্যকাম বিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত ঋগ্বেদ সংহিতা, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৮০২ ও ১৮০৩)

৫. ঋগ্বেদ, বই ৬, স্তবক ৪৫, শ্লোক ১৬

"শুধুমাত্র তাঁরই স্তুতি করো যিনি তুলনাহীন ও একক।"
(রালফ টি. এইচ. গ্রিফিথ সম্পাদিত ঋগ্বেদের স্তবকমালা, পৃষ্ঠা ৬৪৮)

**হিন্দু বেদান্তের ব্রহ্মসূত্র**

হিন্দু বেদান্তের ব্রহ্মসূত্র হলো :
"ইকাম ব্রাহ্ম, দেবিত্ব নাস্তে নেহ না নাস্তে কিঞ্চন।"

"সৃষ্টিকর্তা কেবল একজনই, আর কোনো উপাস্য নেই,
আদৌ নেই, কখনো না, একদমই না।"

হিন্দুধর্ম গ্রন্থ থেকে ওপরে উদ্ধৃত সকল শ্লোক ও অনুচ্ছেদ স্পষ্টতই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহর একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব প্রকাশ করে। এছাড়াও, এসকল শ্লোক ও অনুচ্ছেদে একক ও সত্য স্রষ্টা ব্যতীত অন্য সকল দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার ও বাতিল করে। এসকল শ্লোকে একেশ্বরবাদকেই তুলে ধরে।

সেজন্য কেউ যদি মনোযোগ ও সতর্কতার সাথে হিন্দুধর্ম গ্রন্থ পাঠ করেন, তাহলে তিনি হিন্দুত্ববাদে স্রষ্টার সঠিক ধারণা বুঝতে পারবেন এবং উপলব্ধি করতে পারবেন।

# ৫

# ইসলামে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ধারণা

কুরআনেও একত্ববাদের কথা বলা হয়। সুতরাং সৃষ্টিকর্তার ধারণার ক্ষেত্রেও আপনি হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে মিল খুঁজে পাবেন।

## ক. ব্যাখ্যাসহ সূরা ইখলাস

পবিত্র কুরআনের ১১২ নম্বর সূরা ইখলাসের ১-৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ সম্পর্কে সবচেয়ে চমৎকার ও যথার্থ ধারণা প্রদান করা হয়েছে :

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ. اَللّٰهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

"বল, তিনি আল্লাহ্, এক ও অদ্বিতীয়; আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, স্বয়ংসম্পূর্ণ; তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং কাহারো কাছ থেকে জন্ম নেন নাই; এবং তাহার সমতুল্য কেহ নাই।"

'আস সামাদ' শব্দের অর্থ আল্লাহর অস্তিত্বই কেবল অবিনশ্বর বা চিরস্থায়ী আর সব কিছুই নশ্বর বা অস্থায়ী। এর আরো একটি অর্থ হল আল্লাহ্ কারো ওপর নির্ভরশীল নয়, কিন্তু সকল ব্যক্তি ও বস্তু তার ওপর নির্ভরশীল।

## এটাই ধর্মতত্ত্বের পরশপাথর

পবিত্র কুরআনের ১১২ নম্বর সূরা ইখলাস হলো ধর্মতত্ত্বের পরশপাথর। গ্রিক ভাষায় 'থিউ [Theo] বা ধর্ম' শব্দের অর্থ 'আল্লাহ্' এবং 'লজি [logy] বা তত্ত্ব' শব্দের অর্থ অধ্যয়ন। সুতরাং 'ধর্মতত্ত্ব' অর্থ আল্লাহ সম্পর্কে অধ্যয়ন করা এবং সূরা ইখলাস আল্লাহ্র সম্পর্কে অধ্যয়নের পরশপাথর।

আপনি যদি স্বর্ণালংকার ক্রয় বা বিক্রয় করতে চান, তাহলে আপনি প্রথমেই চাইবেন তা যাচাই করতে। স্বর্ণকার পরশ পাথরের সাহায্যে স্বর্ণালংকার যাচাই করে থাকে। তিনি স্বর্ণালংকার পরশপাথরের ওপর ঘষেন এবং এর রং তিনি যে স্বর্ণালংকারটি ঘষেছেন তার রংয়ের সাথে তুলনা করেন। এটি যদি ২৪ ক্যারট স্বর্ণের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হয় তাহলে তিনি বলবেন, আপনার অলংকারটি ২৪

ক্যারটের খাঁটি সোনা। যদি এটি উচ্চমানের খাঁটি সোনা না হয়, তাহলে তিনি এর মূল্য বলে দেবেন, হয় ২২ ক্যারট বা ১৮ ক্যারট বা আদৌ হয়ত এটি সোনাই নয়। এটি নকলও হতে পারে, কেননা চকচক করলেই সোনা হয় না।

তেমনি সূরা ইখলাস (আল কুরআনের ১১২ নম্বর সূরা) হলো ধর্মতত্ত্বের পরশ পাথর। আপনি যাকে উপাসনা করছেন তিনি প্রকৃত স্রষ্টা না নকল স্রষ্টা এটি দিয়ে তা যাচাই করা যায়। সুতরাং কুরআনের ভাষায় সূরা ইখলাস হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহর চার লাইনের একটি পরিচয়। কেউ যদি দাবি করে বা কাউকে যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলে বিশ্বাস করা হয় এবং তিনি এই চার লাইনের সংজ্ঞার মধ্যে পড়েন তাহলে আমরা মুসলমানেরা তাকে আল্লাহ্ বলে মেনে নিতে প্রস্তুত আছি। পবিত্র কুরআনের সূরা ইখলাস হলো একটি অগ্নিপরীক্ষা। এটি হলো 'ফুরকান' বা প্রকৃত স্রষ্টা এবং স্রষ্টা হবার মিথ্যা দাবিদার যাচাইয়ের মানদণ্ড। সুতরাং পৃথিবীর যে কোনো মানুষ যারই উপাসনা করুক, তিনি যদি সূরা ইখলাসে প্রদত্ত মানদণ্ড পূরণ করেন, তাহলে তিনিই উপাস্য এবং সত্যিকার সৃষ্টিকর্তা।

### খ. আল্লাহর গুণাবলি

আল্লাহ্ সবচেয়ে সুন্দর নামগুলোর অধিকারী :

১) কুরআনের ১৭ নম্বর সূরা আল ইস্‌রার ১১০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى.

বল : "তোমরা 'আল্লাহ্' নামে আহ্বান কর বা 'রাহমান' নামে আহ্বান কর; তোমরা যে নামেই আহ্বান কর সকল সুন্দর নামই তো তারই"।

আপনি আল্লাহকে যে কোনো নামে ডাকতে পারেন কিন্তু তা হতে হবে সুন্দর এবং তা আপনার মানসপটে আল্লাহ্‌র কোন ছবি তুলে ধরবে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ৯৯ টি ভিন্ন ভিন্ন গুণবাচক নাম রয়েছে। এগুলোর কয়েকটি হলো আর-রাহমান, আর-রাহিম, আল-হাকিম– অর্থ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু এবং সর্বজ্ঞ। আল্লাহর বহু গুণবাচক নামের মধ্যে যে নামটি দিয়ে তাঁর সবগুণ ধারণ করে তাঁকে বোঝানো যায় সে নামটি হলো 'আল্লাহ্'। আল্লাহ্ যে সবচেয়ে সুন্দর নামগুলোর অধিকারী কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় তা বলা হয়েছে।

আল কুরআনের ৭নং সূরা আরাফের ১৮০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْۤ اَسْمَاۤئِهٖ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

"আল্লাহ্র জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেই সকল নামেই ডাক, আর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন কর; তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে শীঘ্রই দেয়া হবে"।

আল কুরআনের ২০ নং সূরা ত্বহার ৮ নং আয়াতের বলা হয়েছে–

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ. لَهُ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى.

"আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, সুন্দর সুন্দর নাম তাঁরই"।

আল কুরআনের ৫৯ নং সূরা হাশরের ২৩ এবং ২৪ আয়াতে বলা হয়েছে–

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ اَلْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতিব মহামান্বিত। তারা যাকে শরিক স্থির করে আল্লাহ্ তা হতে পবিত্র, মহান"।

তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, তাঁরই সকল উত্তম নাম। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"।

### গ.'গড' বা 'ঈশ্বর' শব্দের চেয়ে আল্লাহ্ নামটি অধিকতর পছন্দনীয় বা অগ্রাধিকারযোগ্য

মুসলমানেরা ইংরেজি শব্দ 'গড' বা 'ঈশ্বর'-এর পরিবর্তে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকে (সুবহানাহু তা'আলা) আল্লাহ্ নামে ডাকতে বেশি পছন্দ করে। আরবি শব্দ আল্লাহ্ খাঁটি ও অদ্বিতীয়; ইংরেজি শব্দ গডের মত তা বিভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয় না। যেমন :

আপনি যদি 'গড' [God] শব্দটির সাথে 'এস' [S] যুক্ত করেন, তাহলে তা গডের বহুবচন 'গডস্' [Gods]-এ রূপান্তরিত হবে। কিন্তু আল্লাহ্ হচ্ছে এক ও অদ্বিতীয় এবং আল্লাহ্র কোন বহুবচন নেই। আপনি যদি গডের সাথে 'ডেস' [dess] শব্দটি যুক্ত করেন, তাহলে তা হবে 'গডেস' [Goddess] যা গডের স্ত্রী লিঙ্গ। কিন্তু স্ত্রী আল্লাহ্ বা পুরুষ আল্লাহ্ বলে কিছু নেই। আল্লাহ্র কোন লিঙ্গ নেই। আপনি যদি গড শব্দটির সাথে ফাদার শব্দটি যুক্ত করেন, তাহলে তা হবে 'গডফাদার' [Godfather]। "সে আমার গডফাদার" অর্থ হল "সে আমার অভিভাবক"। ইসলামে আল্লাহ্ আব্বা বা আল্লাহ্ পিতা বলে কোন কিছু নেই। আপনি যদি গডের সাথে মাদার শব্দটি যুক্ত করেন তাহলে তা হবে 'গডমাদার' [Godmather]। ইসলামে আল্লাহ্ আম্মি বা আল্লাহ্ মাতা বলে কিছু নেই। আপনি যদি গড শব্দটির পূর্বে টিন [Tin] শব্দটি যুক্ত করেন তাহলে তা হবে নকল আল্লাহ্ কিন্তু ইসলামে টিন আল্লাহ্ বা নকল আল্লাহ্ বলে কিছু নেই।

আল্লাহ্ একটি অনন্য শব্দ, যার দ্বারা আমাদের মানসপটে কোন ছবি ভেসে ওঠে না এবং তা অন্যকোন রূপ ধারণ করে না। তাই মুসলমানেরা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকে বোঝাতে আল্লাহ্ শব্দটি ব্যবহার করতে পছন্দ করে। কিন্তু অনেক সময় অমুসলিমদের সাথে কথা বলার সময় আমাদেরকে হয়ত আল্লাহ্কে বোঝাতে অযথার্থ শব্দ যেমন, গড, ঈশ্বর বা ভগবান ব্যবহার করতে হতে পারে।

**হিন্দু ধর্মগ্রন্থে আল্লাহ্ শব্দটির উল্লেখ রয়েছে।**

'আল্লাহ', আরবিতে যার অর্থ সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা, শব্দটি নিম্নোক্ত স্থানে উল্লেখ আছেঃ

ঋগ্বেদ, বই ২, স্তবক ১, শ্লোক ১১

ঋগ্বেদ, বই ৩, স্তবক ৩০, শ্লোক ১০

ঋগ্বেদ, বই ৯, স্তবক ৬৭, শ্লোক ৩০

আলো উপনিষদ নামে একটি উপনিষদও আছে।

# ৬

# ইসলাম ও হিন্দুধর্ম গ্রন্থে একই ধরনের আয়াত বা শ্লোক

আমরা আগেই বলেছি যে ইসলামি মতে, আল্লাহর সবচেয়ে চমৎকার ও সঠিক সংজ্ঞা পবিত্র কুরআনের ১১২ নম্বর সূরা ইখলাসের ১-৪ নম্বর আয়াতে,

قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ. اَللهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

"বল, তিনি আল্লাহ্, এক ও অদ্বিতীয়; আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, স্বয়ংসম্পূর্ণ; তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং কাহারো কাছ থেকে জন্ম নেন নাই এবং তাহার সমতুল্য কেহ নাই।"

হিন্দুধর্ম গ্রন্থে এমন অনেক অনুচ্ছেদ রয়েছে যা কুরআনের সূরা ইখলাসের ১-৪ আয়াতের অনুরূপ অর্থ বহন করে। যেমন,

| ইসলাম | হিন্দুধর্ম |
|---|---|
| قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ. اَللهُ الصَّمَدُ.<br>বল : তিনি আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়;<br>(সূরা ইখলাস, আয়াত ১) | "ইকাম ইভানদ্বিতীয়াম"<br>"তিনি এক, যার কোনো দ্বিতীয় নেই"<br>(ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬:২:১) |
| لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ.<br>আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, স্বয়ংসম্পূর্ণ;<br>তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই,<br>এবং কাহারো থেকে জন্ম নেন নাই;<br>(সূরা ইখলাস, আয়াত ২ ও ৩) | "তিনিই সে যে আমাকে জানে অজাত, অনাদি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে।" (ভগবদ্‌গীতা ১০:৩) এবং "তার থেকে কোন পিতামাতা বা প্রভু জন্মে নাই" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬:৯) |
| وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ<br>এবং তাহার সমতুল্য কেহ না<br>(সূরা ইখলাস, আয়াত ৪) | "ন তস্য প্রতিমা আস্তি"<br>"তাঁর মত আর কেহই নাই।"<br>(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪:১৯ এবং যজুর্বেদ ৩২:৩) |

মনে রাখবেন হিন্দু বেদান্তের ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্টতই ঘোষণা করা হয়েছে যে:

"ইকাম ব্রাহ্ম, দেবিত্ব নাস্তে নেহ না নাস্তে কিঞ্চন"

"সৃষ্টিকর্তা কেবল একজনই, আর কোনো উপাস্য নেই, আদৌ নেই, কখনো না, একদমই না।"

৭

# হিন্দুধর্ম ও ইসলামে ফেরেশতা বা দেবদূতের ধারণা

এখন আমরা এ দু'টি প্রধান ধর্মে আল্লাহর ফেরেশতাদের সম্পর্কে বিশ্বাস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখব এবং এদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য রয়েছে কিনা তাও দেখব।

## ১. ইসলামে ফেরেশতা বা দেবদূত

ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র (সুবহানাহু তা'আলা) সৃষ্টি। তারা আলোর (নূরের) তৈরি এবং তাদেরকে সাধারণত দেখা যায় না। তাদের নিজস্ব কোন ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই এবং তারা সবসময় সর্বশক্তিমান আল্লাহর হুকুম পালন করে। তাদের নিজস্ব কোন স্বাধীন ইচ্ছা না থাকায় তারা আল্লাহর অবাধ্য হতে পারে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ বিভিন্ন ফেরেশতাকে বিভিন্ন কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন। যেমন, হযরত জিব্রাঈল [আ.] আল্লাহর বাণী তাঁর নবীদের কাছে পৌঁছে দেয়ার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

যেহেতু ফেরেশতারা আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহ্‌ নয়, তাই মুসলমানেরা তাদের উপাসনা করে না।

## ২. হিন্দুধর্মে ফেরেশতা বা দেবদূত

হিন্দুধর্মে দেবদূত বা ফেরেশতা সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা নেই। তবে হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে কিছু অতিমানব রয়েছেন যারা সাধারণ মানুষ যা করতে পারে না, তারা তাও করতে পারেন। এইসব অতিমানবদেরকেও কোনো কোনো হিন্দু দেবতা হিসেবে উপাসনা করে থাকে।

# হিন্দুধর্ম ও ইসলামে আল্লাহর বাণী বা ঐশ্বরিক বাণী (ওহি) সম্পর্কে ধারণা

আসুন এখন আমরা দেখি ইসলাম ও হিন্দুধর্মের গ্রন্থে ঈশ্বরের বাণী (ওহি) বা মানবজাতির হেদায়াতের লক্ষ্যে প্রেরিত আসমানি কিতাব সম্পর্কে কি বলা হয়েছে।

**১. ইসলামে আল্লাহর বাণী (ওহি) সম্পর্কে ধারণা**

১) আল্লাহ্ (সুবহানাহু তা'আলা) প্রত্যেক যুগেই ওহি নাযিল করেছেন বা আসমানি কিতাব প্রেরণ করেছেন। কুরআনে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেছেন :

لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ.

"প্রত্যেক যুগেই আসমানি কিতাব প্রেরণ করা হয়েছে"। (সূরা রা'দ, আয়াত ৩৮)

২) কুরআনে চারটি আসমানি কিতাবের নাম রয়েছে :

বিভিন্ন যুগে ওই যুগের মানুষকে হেদায়েত বা দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য আল্লাহ (সুবহানাহু তা'আলা) বেশ কিছু আসমানি কিতাব নাযিল করেন। কুরআনে কেবল চারটি আসমানি কিতাবের নামের উল্লেখ রয়েছে। এগুলো হলো : যাবুর, তাওরাত, ইনজিল ও কুরআন, যার সবগুলোই ওহি বা আল্লাহ প্রেরিত প্রত্যাদেশ। যাবুর হযরত দাউদের (আ.) ওপর নাযিল হয়েছে এবং তাওরাত হযরত মুসার (আ.) ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। ইনজিল নাযিল হয়েছে হযরত ঈসার (আ.) ওপর এবং কুরআন হচ্ছে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ওহি যা অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদের (সা.) ওপর।

৩) পূর্ববর্তী সব আসমানি কিতাব একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য এবং একটি বিশেষ সময়কালের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হবার পূর্বে অবতীর্ণ সকল আসমানি কিতাব একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য ও কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল।

৪) কুরআন যেহেতু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানি কিতাব,

তাই কুরআন সমগ্র মানব জাতির জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। এটি কেবল মুসলমান বা আরব জাতির জন্য অবতীর্ণ হয়নি বরং এটি সমগ্র মানবজাতির জন্যই অবতীর্ণ হয়েছিল। অধিকন্তু কুরআন কেবল মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সা.) সময়কালের জন্য অবতীর্ণ হয় নাই বরং কিয়ামাতের আগ পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

ক. পবিত্র কুরআনের ১৪ নম্বর সূরা ইবরাহীমের ১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

الـــرٰ قف كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ.

"আলিফ-লাম্-রা, এই কিতাব, ইহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি মানবজাতিকে তাহাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বাহির করিয়া আনিতে পার অন্ধকার হইতে আলোকে, তাঁহার পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ"!

যেহেতু বিচারদিবসের আগ পর্যন্ত এটিই চূড়ান্ত ওহি তাই এটিকে অবিকৃতভাবে সংরক্ষণ করার বিষয়টি অগ্রাহ্য করার কোন উপায় নেই। পবিত্র কুরআনেও এ ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে :

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ.

"আমিই (নিঃসন্দেহে) কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং অবশ্যই আমিই উহার সংরক্ষক (যে কোন ধরনের বিকৃতি থেকে)।" সূরা আল হিজ্‌র, আয়াত ৯

খ. কুরআনের ১৪ নম্বর সূরা ইবরাহীমের ৫২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন :

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْآ اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُوْلُوا الْاَلْبَابِ.

"ইহা মানুষের জন্য এক বার্তা, যাহাতে ইহা দ্বারা উহারা সতর্ক হয় এবং জানিতে পারে যে তিনিই একমাত্র ইলাহ্ এবং যাহাতে বোধশক্তিসম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে"।

গ. কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ.

"রামাযান মাস, ইহাতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নির্দশন এবং সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে"।

ঘ. কুরআনের ৩৯ নম্বর সূরা যুমারের ৪১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন :

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ.

"আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি মানুষের জন্য"।

আল কুরআন হলো আল্লাহর বাণী। এটি ইসলামের সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ। এটি সর্বশক্তিমান আল্লাহর সর্বশেষ ও চূড়ান্ত গ্রন্থ, যা ইংরেজি ষষ্ঠ শতকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহানবী মুহাম্মদের (সা.) ওপর নাজিল হয়েছে।

৫) পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে এবং অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থগুলোতে পবিত্র কুরআনের উল্লেখ করা হয়েছিল।

কুরআনের ২৬ নম্বর সূরা শু'আরার ১৯৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ.

"পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ রয়েছে।"

পূর্ববর্তী সকল কিতাব ও বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগ্রন্থে আল্লাহ্র এই সর্বশেষ ও চূড়ান্ত গ্রন্থ পবিত্র কুরআনের কথা উল্লেখ ছিলো।

৬. আল হাদীস : কুরআন ছাড়া ইসলামের অন্য পবিত্র গ্রন্থটি হলো হাদীস অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সা.) বাণী ও জীবনাচরণ। এসব হাদীস হলো পবিত্র কুরআনের সম্পূরক। এগুলো কুরআনের কোন শিক্ষাকে বাতিল করতে পারে না এবং কুরআনের বিপরীত কোন কথা বলতে পারে না।

## ২) হিন্দুধর্ম গ্রন্থ

হিন্দুধর্মে দুই ধরনের পবিত্র গ্রন্থ রয়েছেঃ শ্রুতি ও স্মৃতি।

শ্রুতি অর্থ যা শোনা হয়েছে, উপলব্ধি করা হয়েছে, বোঝা গেছে বা প্রকাশ করা হয়েছে। এটি হিন্দুধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র ও প্রাচীন। শ্রুতি দুটি প্রধান অংশে বিভক্তঃ বেদ ও উপনিষদ। মনে করা হয় এগুলো ঈশ্বরের বাণী।

স্মৃতি শ্রুতির মত এত পবিত্র নয়। তথাপি এটিকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং আজকাল হিন্দুদের মধ্যে এটি বেশ জনপ্রিয়। স্মৃতি অর্থ মনে রাখা। এই হিন্দু সাহিত্য বোঝাটা সহজ, কেননা এটি জগতের সত্যগুলোকে প্রতীক ও পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে তুলে ধরে। স্মৃতিকে ঈশ্বরের বাণী হিসেবে

বিবেচনা করা হয় না বরং মানুষের রচিত কাহিনী হিসেবে গ্রহণ করে নেয়া হয়। স্মৃতি ব্যক্তির, সম্প্রদায়ের ও সমাজের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মকানুন প্রতিষ্ঠা করে যা তাদের প্রাত্যহিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে। এগুলো ধর্মশাস্ত্র নামেও পরিচিত। স্মৃতির মধ্যে পুরাণ ও ইতিহাসসহ বিভিন্ন ধরনের লেখা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

হিন্দুদের বেশ কিছু ধর্মগ্রন্থ রয়েছে; এগুলোর মধ্যে রয়েছে বেদ, উপনিষদ এবং পুরাণ।

১. বেদ

ক) 'বেদ' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ 'বিদ' থেকে এসেছে যার অর্থ জানা। সুতরাং 'বেদ' শব্দটির অর্থ হলো সর্বোত্তম জ্ঞান বা পবিত্র জ্ঞান। বেদের চারটি প্রধান ভাগ রয়েছে। (সংখ্যা অনুসারে এগুলোর সংখ্যা ১১৩১ হলেও এগুলোর মধ্যে ডজনখানেক পাওয়া যায়। পতাঞ্জলির মহাভাষ্য মতে, ২১ ধরনের ঋগ্বেদ, ৯ ধরনের অথর্ববেদ, ১০১ ধরনের যজুর্বেদ এবং ১০০০ ধরনের সামবেদ রয়েছে।)

খ) ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদকে সর্বাধিক প্রাচীন গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এটি 'ত্রিবিদ্যা' বা 'ত্রিবিজ্ঞান' হিসেবে পরিচিত। ঋগ্বেদ সবচেয়ে প্রাচীন এবং তিনটি দীর্ঘ ও পৃথক সময়কে এটি একত্রিত করেছে। ৪র্থ বেদটি হলো অথর্ববেদ যা পরবর্তীতে এসেছে।

**ঋগ্বেদে** প্রধানত রয়েছে প্রশংসা গীত।

**যজুর্বেদে** আছে আত্মত্যাগের কথা।

**সামবেদে** রয়েছে সুমিষ্ট গীত।

**অথর্ববেদে** রয়েছে বেশকিছু যাদুমন্ত্র।

গ) চারটি বেদ সংকলিত বা প্রকাশিত হবার দিনতারিখ সম্পর্কে কোন সর্বসম্মত মতামত জানা যায় না। আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দের মতে, ১৩১ কোটি বছর পূর্বে বেদ প্রকাশিত হয়েছিল এবং অন্যান্য পণ্ডিতদের মতে এগুলোর বয়স ৪০০০ বছরের বেশি হবে না।

ঘ) তেমনি কোন্ স্থানে এগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল এবং কোন্ ঋষিদের ওপর এগুলো অবতীর্ণ করা হয়েছিল সে সম্পর্কেও মতবিরোধ রয়েছে। এ ধরনের মতবিরোধ সত্ত্বেও বেদকে হিন্দুধর্মের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ ও আসল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

## ২. উপনিষদ

ক) উপনিষদ শব্দটি এসেছে 'উপ' যার অর্থ 'কাছে', 'নি' যার অর্থ 'নিচে' এবং 'ষদ' যার অর্থ 'বসা'--এই তিনটি শব্দ থেকে। সুতরাং উপনিষদ শব্দটির অর্থ কাছে নিচে বসা। একদল শিষ্য গুরুর কাছ থেকে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য গুরুর নিকটে বসে থাকে।

সঙ্কর অনুসারে, উপনিষদ মূল শব্দ 'সদ' থেকে এসেছে যার অর্থ 'ঢিলা দেওয়া', 'পৌঁছানো' বা 'ধ্বংস করা', 'উপ' এবং 'নি' হচ্ছে উপসর্গ। সুতরাং উপনিষদ অর্থ 'ব্রহ্মজ্ঞান' যার মাধ্যমে অজ্ঞতাকে ধ্বংস করা যায়।

২০০টিরও বেশি উপনিষদ রয়েছে, যদিও ভারতীয় ঐতিহ্য একে ১০৮-এ সীমাবদ্ধ রেখেছে। ১০টি মূল উপনিষদ রয়েছে, যদিও অনেকে মনে করেন এদের সংখ্যা ১০-এর বেশি, অন্যদিকে অন্যান্যরা বলেন ১৮টি।

খ) বেদান্ত বলতে উপনিষদকেই বোঝায়, যদিও এ শব্দটি এখন উপনিষদের ওপর ভিত্তি করে যে দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়। আক্ষরিক অর্থে, বেদান্ত অর্থ বেদের শেষ, বেদস্য-অন্ত, বেদের উপসংহার এবং বেদের লক্ষ্য। বেদের সমাপ্তি অংশগুলোই হলো উপনিষদ এবং তা বৈদিক যুগের শেষের দিকেই এসেছে।

গ) কিছু পণ্ডিত উপনিষদকে বেদের চাইতে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন মনে করে।

## ৩. ইতিহাস-মহাকাব্য

হিন্দুধর্মের দু'টি ইতিহাস বা মহাকাব্য রয়েছে। একটি হলো রামায়ণ এবং অপরটি মহাভারত।

ক) রামায়ণ একটি মহাকাব্য যা রামের জীবনগাঁথা বর্ণনা করে। অধিকাংশ হিন্দুই রামায়ণের কাহিনী জানে।

খ) মহাভারত আরেকটি অসাধারণ মহাকাব্য, যেখানে চাচাতো ভাই– পাণ্ডব ও কৌরবের মধ্যে বিবাদ দেখানো হয়। এতে কৃষ্ণের জীবন কাহিনীও রয়েছে। মহাভারতের কাহিনীও অধিকাংশ হিন্দুই জানে।

## ৪. ভগবদ্গীতা

হিন্দুধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে ভগবদ্গীতা সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সুপরিচিত গ্রন্থ। এটি মহাকাব্য মহাভারতের একটি অংশ এবং এতে বিশ্বমা পর্বের অধ্যায় ২৫ থেকে ৪২ পর্যন্ত ১৮টি অধ্যায় রয়েছে। এতে কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধের ময়দানে যে উপদেশ দিয়েছিল তাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

## ৫. পুরাণ

শুদ্ধতার ক্রমানুসারে এরপর আসে পুরাণ, যা সবচাইতে বেশি পঠিত গ্রন্থ। পুরাণ শব্দের অর্থ হলো প্রাচীন। পুরাণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ইতিহাস, আর্যজাতির আদি ইতিহাস এবং হিন্দু দেব-দেবীদের জীবন ইতিহাস রয়েছে। বেদের মতই পুরাণও অবতীর্ণ গ্রন্থ, যেগুলো বেদের সাথে একই সময়ে বা কাছাকাছি সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে। মহাঋষি ব্যাস পুরাণকে ১৮টি বিশাল বিশাল খণ্ডে ভাগ করেছেন। পুরাণগুলোর মধ্যে প্রধান গ্রন্থটি হলো *ভবিষ্য পুরাণ*। এটিকে এ নামে আখ্যায়িত করা হয় কারণ এতে ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্পর্কে পূর্বাভাস রয়েছে। ভবিষ্য পুরাণকে হিন্দুরা ঈশ্বরের বাণী মনে করে। মহাঋষি ব্যাসকে মনে করা হয় এই গ্রন্থগুলোর সংকলক হিসেবে এবং প্রকৃত রচয়িতা মনে করা হয় ভগবানকে।

## ৬. অন্যান্য গ্রন্থ

হিন্দুদের আরো অনেক ধর্মগ্রন্থ রয়েছে, যেমন, মনুস্মৃতি ইত্যাদি।

## ৭. সবচেয়ে শুদ্ধ হিন্দুধর্মগ্রন্থ হল বেদ

হিন্দুধর্ম গ্রন্থগুলোর মধ্যে বেদকে শুদ্ধতম গ্রন্থ বলে বিবেচনা করা হয়। কোন হিন্দু ধর্মগ্রন্থই বেদকে বাতিল করে না। হিন্দু পণ্ডিতদের মতে, বেদ ও অন্য হিন্দুধর্ম গ্রন্থের মধ্যে যদি কোন বিরোধ বা বৈপরিত্য দেখা দেয় তাহলে বেদের মতই গ্রহণ করা হবে।

এভাবেই আমরা ইসলাম ও হিন্দুধর্মের গ্রন্থগুলোর আলোকে ইসলাম ও হিন্দুধর্মে দেবদূত বা ফেরেশতা ও অবতীর্ণ গ্রন্থ সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে যে সাদৃশ্য রয়েছে তা পর্যালোচনা করলাম এবং তুলে ধরলাম। এই বইয়ের পরবর্তী লেখাগুলোতে আমরা নবুওয়ত, মৃত্যুর পরের জীবন, ভাগ্য ও গন্তব্য এবং ইবাদত/উপাসনা সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে ইসলাম ও হিন্দুধর্ম যে মিল ও সাদৃশ্য রয়েছে তা আলোচনা করব।

এখন আমরা দেখব নবুওয়ত ও আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে কি ধরনের সাদৃশ্য রয়েছে।

৯

# হিন্দুধর্ম ও ইসলামে নবুওয়তের ধারণা

## ক) ইসলামে নবী-রাসূল

সর্বশক্তিমান আল্লাহর দূত বা নবীগণ হলেন আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ যাঁরা মানুষের কাছে মহান আল্লাহ তা'আলা বাণী পৌঁছে দেন।

### প্রত্যেক জাতির কাছেই নবী-রাসূল পাঠানো হয়েছে

ক. কুরআনের ১০ নম্বর সূরা ইউনুসের ৪৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ (সুবহানু ওয়া তা'আলা) বলেছেন :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلٌ فَاِذَا جَاءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ.

"প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রাসূল এবং যখন উহাদের রাসূল আসিয়াছে তখন ন্যায়বিচারের সহীত উহাদের মীমাংসা হইয়াছে এবং উহাদের প্রতি জুলুম করা হয় নাই।"

খ. কুরআনের ১৬ নম্বর সূরা নাহলের ৩৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ (সুবহানু ওয়া তা'আলা) বলেছেন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّغُوْتَ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَلَةُ ط فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ.

"আল্লাহর ইবাদত করিবার ও তাগুতকে বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি। অতঃপর উহাদের কতককে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহাদের কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হইয়াছিল; সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহাদের পরিণাম কী হইয়াছে"।

গ. কুরআনের ৩৫ নম্বর সূরা ফাতিরের ২৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ (সুবহানু ওয়া তা'আলা) বলেছেন :

وَانْ مِّنْ اُمَّةٍ الاَّ خَلاَفِيْهَا نَذِيْرٌ.

"এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহার নিকট সর্তককারী প্রেরিত হয় নাই"।

ঘ. কুরআনের ১৩ নম্বর সূরা রা'দের ৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ (সুবহানু ওয়া তা'আলা) বলেছেন :

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ.

"এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে পথপ্রর্দশক"।

## কুরআন ও হাদীসে কিছু কিছু রাসূলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে

হযরত আদম (আ.), হযরত শীস (আ.), হযরত ইদ্রিস (আ.), হযরত নূহ (আ.), হযরত হূদ (আ.), হযরত সালেহ (আ.), হযরত লুত (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত ইসমাঈল (আ.), হযরত ইসহাক (আ.), হযরত ইয়াকুব (আ.), হযরত ইউসুফ (আ.), হযরত শোয়েব (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত সুলায়মান (আ.), হযরত ইলিয়াস (আ.), হযরত আল ইয়াসা (এলিশা) (আ.), হযরত মুসা (আ.), হযরত আজিজ (উজায়ের বা এজরা) (আ.), হযরত আইয়ুব (আ.), হযরত জুলকিফ্ল (আ.), হযরত ইউনুস (আ.), হযরত জাকারিয়া (আ.), হযরত ইয়াহিয়া (আ.), হযরত ঈসা (আ.) এবং সর্বশেষ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

## কুরআনে কেবল কয়েকজন নবী-রাসূলের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে

ক. কুরআনের ৪ নম্বর সূরা নিসার ১৬৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ط وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا.

"অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছি যাহাদের কথা পূর্বে আমি তোমাকে বলিয়াছি এবং অনেক রাসূল ছিলেন, যাহাদের কথা তোমাকে বলি নাই এবং মূসার সহিত আল্লাহ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করিয়াছিলেন"।

খ. কুরআনের ৪০ নম্বর সূরা গাফিরের (মুমিনুন) ৭৮ আয়াতে বলা হয়েছে :

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ.

"আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম, আমি তাহাদের কাহারো কাহারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করিয়াছি এবং কাহারো কাহারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করি নাই"।

**আল্লাহ ১,২৪,০০০ নবী প্রেরণ করেছেন**

মিশকাতুল মাসাবিহ-এর ৩য় খণ্ড হাদীস নম্বর ৫৭৩৭, আহমদ বিন হাম্বাল, ৫ম খণ্ড পৃষ্ঠা ২৬৫-২৬৬-এর সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে :

"আল্লাহ (সুবহানাহু তা'আলা) ১,২৪,০০০ নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন"।

**পূর্ববর্তী রাসূলদের কেবল তাদের স্বজাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল**

মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সা.) পূর্বে যত নবী-রাসূল এসেছেন তাদের সবাইকে তাদের নিজ নিজ জনগোষ্ঠী ও স্বজাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তারা যে বাণী প্রচার করে তা কেবল ওই যুগের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছিল।

**মহানবী মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ ও চূড়ান্ত রাসূল**

কুরআনের ৩৩ নম্বর সূরা আল আহযাবের ৪০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ط وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا.

"মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহেন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ"।

**মহানবী হযরত মুহাম্মদকে (সা.) সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে**

ক. যেহেতু মহানবী মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী ও রাসূল, তাই তাকে কেবল মুসলমান বা আরবদের জন্য নয় বরং সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। কুরআনের ২১ নম্বর সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নম্বর আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে :

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.

"আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করিয়াছি"।

খ. পবিত্র কুরআনের ৩৪ নম্বর সূরা সাবার ২৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

"আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না"।

গ. সহীহ বুখারি প্রথম খণ্ড, সালাত সম্পর্কিত পাঠ, অধ্যায় ৫৬, হাদীস ৪২৯-তে বলা হয়েছে,

"আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক নবীকে কেবল স্বজাতির কাছে পাঠানো হয়েছে কিন্তু আমাকে সমগ্র মানব জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে।"

## খ) হিন্দুধর্মে অবতার ও দূত

### ১. সাধারণ হিন্দুদের মতে অবতার

ক. সাধারণ হিন্দুদের অবতার সম্পর্কে ধারণা এখানে বলা হল। অবতার একটি সংস্কৃত শব্দ যেখানে 'অব' অর্থ 'নিচে' এবং 'তর' অর্থ 'নামা'। সুতরাং অবতার অর্থ নিচে নামা বা নিচে নেমে আসা। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে অবতার শব্দের অর্থ, "(হিন্দু পুরাকাহিনীতে) কোন দেবতা বা মুক্ত আত্মার রক্তমাংশের শরীর নিয়ে পৃথিবীতে আগমন।" সহজ কথায়, সাধারণ হিন্দুদের মতে অবতার হল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মানুষের রূপে দেহ নিয়ে পৃথিবীতে আগমন।

সাধারণ হিন্দুরা বিশ্বাস করে, ধর্মকে রক্ষা করার জন্য, দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য বা মানবজাতির জন্য বিধিবিধান প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বর রক্তমাংসের শরীর নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন। হিন্দুদের সবচেয়ে পবিত্রগ্রন্থ শ্রুতির অন্তর্ভুক্ত বেদের কোথাও অবতার কথাটির উল্লেখ নেই। তবে স্মৃতিতে অর্থাৎ পুরাণ ও ইতিহাসে এর উল্লেখ রয়েছে।

খ. হিন্দুদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও ব্যাপক পঠিত বইয়ে এর উল্লেখ রয়েছে

১) ভগবদ্‌গীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৭-৮:

"যেখানেই ন্যায়ের অবক্ষয় দেখা দেয়, হে ভরত, এবং অন্যায়-অবিচার বেড়ে যায়, তখনই আমি নিজেকে প্রকাশ করি। শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি প্রত্যেক যুগেই জন্মগ্রহণ করি।"

২) ভগবৎ পুরাণে এর উল্লেখ রয়েছে ৯:২৪:৫৬,

"যেখানেই ন্যায়ের অবক্ষয় এবং পাপের বৃদ্ধি ঘটে, সেখানেই মহান স্রষ্টা নিজেকে প্রকাশ করেন।"

## ২. বেদে ও ইসলামে কোন অবতার নয় বরং দূতের কথা উল্লেখ রয়েছে

ইসলাম বিশ্বাস করে না যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মানুষের রূপ ধারণ করেন। তিনি মানুষদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচিত করেন এবং তার সাথে উচ্চতর পর্যায়ে যোগাযোগ করেন যিনি তাঁর বাণী মানুষের কাছে পৌছে দেন এবং তাকেই বলা হয় আল্লাহর রাসূল বা দূত।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি অবতার শব্দটি এসেছে 'অব' এবং 'তর' থেকে যার অর্থ নিচে নেমে আসা। কতিপয় পণ্ডিতের মতে ঈশ্বরের অবতার একটি সম্বন্ধপদ এবং এর প্রকৃত অর্থ "আল্লাহ্‌র সাথে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এমন ব্যক্তির আগমন।" চারটি বেদেরই বেশ কিছু জায়গায় ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত এসব ব্যক্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। এভাবে আমরা যদি ভগবদ্গীতা ও পুরাণকে সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ বেদের সাথে তুলনা করি তাহলে আমাদেরকে মানতেই হবে যে যখন ভগবদ্গীতা ও পুরাণে অবতারের কথা বলা হয়, তখন ঈশ্বরের নির্বাচিত ব্যক্তিকেই বোঝানো হয়। ইসলামে তাদেরকেই নবী বলা হয়।

# ১০
# স্রষ্টার গুণাবলি

## নরত্বারোপ (anthropomorphism) বা ঈশ্বরের মধ্যে মানব গুণ আরোপ

### ক. মানুষকে বোঝার জন্য স্রষ্টার বা ঈশ্বরের মানুষের রূপ ধারণের প্রয়োজন নেই

সেমিটীয় নয় এমন অনেক ধর্মেই কোন না কোন পর্যায়ে প্রাণী বা বস্তুতে নরত্ব আরোপের, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার মানুষের রূপ ধারণের দর্শনে বিশ্বাসের কথা বলা হয়। যারা এতে বিশ্বাস করে তাদের যুক্তির মধ্যে কমবেশি সাদৃশ্য রয়েছে। তারা বলে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা এত শুদ্ধ ও পূত-পবিত্র যে তিনি মানুষের দুঃখকষ্ট, সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা, সমস্যা, অনুভূতি, স্নেহ-ভালোবাসা, আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন। তিনি জানেন না যখন কোন মানুষ আঘাত পায় বা বিপদে পড়ে তখন সে কেমন অনুভব করে। সুতরাং মানুষের আচার-আচরণ ও কাজকর্মের ক্ষেত্রে বিধিবিধান তৈরির জন্য সৃষ্টিকর্তা মানুষের রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে নেমে আসেন। আপাতদৃষ্টিতে এটিকে যুক্তিযুক্ত মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের এটিকে পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

### খ. সৃষ্টিকর্তা একটি নির্দেশিকা তৈরি করেন

ধরুন আমি একটি টেপ রেকর্ডার তৈরি করলাম, তাহলে টেপ রেকর্ডারের জন্য কোনটি ভালো বা মন্দ তা বোঝার জন্য কি আমাকে টেপ রেকর্ডার হতে হবে? স্বাভাবিক ব্যবহার বা এমনকি ভুল ব্যবহারের কারণে টেপ রেকর্ডারে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে তা বোঝার জন্য প্রস্তুতকারককে নিজেকেই টেপরেকর্ডারের ভূমিকা নেয়ার প্রয়োজন নেই।

সুতরাং, ব্যবহারকারীদের জন্য প্রস্তুতকারক হিসেবে আমি একটি ব্যবহার নির্দেশিকা লিখব। এই ব্যবহার নির্দেশিকায় আমি বলব, অডিও ক্যাসেট শোনার বা চালানোর জন্য ক্যাসেটটি ভেতরে ঢোকান এবং 'প্লে' বাটনে চাপ দিন। বন্ধ করার জন্য 'স্টপ' বাটনে চাপ দিন। আপনি যদি দ্রুত সামনের দিকে যেতে চান,

তাহলে 'ফাস্ট ফরওয়ার্ড' বাটনে চাপ দিন। খুব বেশি ওপর থেকে এটিকে ফেলবেন না যাতে এটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এটিকে পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখবেন না, তাহলে এটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রস্তুতকারকরা একটি ব্যবহার নির্দেশিকা লেখে যাতে কি করা উচিত বা উচিত না তার উল্লেখ থাকে।

## গ. পবিত্র কুরআন মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা

তেমনিভাবে মানুষের জন্য কোনটি ভালো বা মন্দ তা জানতে আমাদের মহান প্রভু ও স্রষ্টা, আল্লাহকে (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) মানুষের রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আসার প্রয়োজন হয় না। যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নিজ সৃষ্টি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। মানবজাতির কল্যাণের জন্য তার কেবল ব্যবহার নির্দেশিকা প্রদান করা প্রয়োজন। সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে এমন একটি নির্দেশিকা মানুষকে নিম্নোক্ত বিষয় অবগত করবে ও ব্যাখ্যা করবেঃ ১) মানব সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২) কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে ৩) ইহ ও পারলৌকিক সাফল্য লাভের জন্য তাদের কি করা উচিত ও কি থেকে বিরত থাকা উচিত। সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নির্দেশিকা হল পবিত্র কুরআন।

## ঘ. আল্লাহ্ তাঁর দূত বা রাসূল নির্বাচিত করেন

এ ব্যবহারবিধি লেখার জন্য স্বয়ং আল্লাহর পৃথিবীতে নেমে আসার প্রয়োজন নেই। তিনি মানুষের মধ্য থেকে তাঁর বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য একজনকে নির্বাচিত করেন এবং ওহির মাধ্যমে উচ্চতর পর্যায়ে তার সাথে যোগাযোগ করেন। এধরনের নির্বাচিত ব্যক্তিকেই বলা হয় আল্লাহর বাণী প্রচারক বা নবী। এসব নির্বাচিত মানবের কাছেই আল্লাহ তাঁর বাণী প্রেরণ করেন।

# সৃষ্টিকর্তা মানুষের রূপ ধারণ করেন না এবং করবেনও না

## ক. সৃষ্টিকর্তা সবকিছু করতে পারেন না

কেউ কেউ বলতে পারে যে সৃষ্টিকর্তা সবকিছু করতে পারেন, তাহলে তিনি মানুষের রূপ ধারণ করতে পারবেন না কেন? সৃষ্টিকর্তা যদি মানুষের রূপ ধারণ করেন তাহলে তিনি আর সৃষ্টিকর্তা থাকেন না। কেননা স্রষ্টার গুণাবলি আর মানুষের গুণাবলি ভিন্ন।

### ১) সৃষ্টিকর্তা অমর কিন্তু মানুষ মরণশীল

সৃষ্টিকর্তা অমর; মানুষ মরণশীল। আপনি কখনো 'ঈশ্বর-মানব' দেখতে পাবেন না অর্থাৎ একইসাথে একজন নশ্বর ও অবিনশ্বর হতে পারে না। এটা অর্থহীন। স্রষ্টার কোন আদি নেই। মানুষের আদি বা শুরু রয়েছে। আপনি এমন কোন ব্যক্তিকে পাবেন না যার একই সাথে আদি রয়েছে আবার আদি নেই। স্রষ্টার কোন অন্ত নেই। মানুষের অন্ত বা শেষ রয়েছে। আপনি এমন কোন অস্তিত্ব পাবেন না যার একই সাথে অন্ত আছে আবার অন্ত নেই। এটি অর্থহীন।

### ২) সৃষ্টিকর্তার খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। মানুষের খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয়। পবিত্র কুরআনের ৬ নম্বর সূরা আনয়ামের ১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ.

"তিনিই আহার্য দান করেন কিন্তু তাঁহাকে কেহ আহার্য দান করে না"।

### ৩) সৃষ্টিকর্তার বিশ্রাম ও নিদ্রার প্রয়োজন হয় না

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তার বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। মানুষের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। সৃষ্টিকর্তার ঘুমাবার প্রয়োজন হয় না। মানুষের ঘুমের প্রয়োজন হয়। পবিত্র কুরআনের আয়াতুল কুরসী, ২ নম্বর সূরা বাকারার ২৫৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

اَللّٰهُ لاَ إِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لاَتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ ط لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ...

"আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ বা উপাস্য নাই তিনি চিরঞ্জীব, স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাঁহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু রয়েছে সমস্ত তাঁহারই..."।

### খ. মানুষ হয়ে অন্যকোন মানুষকে উপাসনা করা পাপ

ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা যদি মানুষের রূপ ধারণ করেন, তাহলে তিনি আর ঈশ্বর থাকেন না এবং মানুষ হয়ে অন্য আরেকজন মানুষকে উপাসনা করা অর্থহীন। মনে করুন আমি একজন অত্যন্ত মেধাবী শিক্ষকের ছাত্র এবং আমি নিয়মিত আমার পড়াশোনার ক্ষেত্রে তার কাছ থেকে সাহায্য ও উপদেশ গ্রহণ করে থাকি। দুর্ভাগ্যবশত তিনি একটি দুর্ঘটনায় পতিত হলেন এবং তার স্মৃতিভ্রম ঘটল। এরপরও তার কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া হবে আমার জন্য বোকামি। কারণ দুর্ঘটনার পর তার স্মৃতিতে পরিবর্তন আসার ফলে তিনি তার পূর্বের দক্ষতা হারিয়ে ফেলেছেন। একইভাবে ঈশ্বর যখন তার ঐশ্বরিক গুণাবলি ত্যাগ করে আমার আপনার মত মানুষে রূপান্তরিত হন তখন আমরা কিভাবে তার উপাসনা করব এবং তার কাছ থেকে ঐশ্বরিক সাহায্য প্রার্থনা করব? কোন ব্যক্তি যদি কোন মানুষের উপাসনা করে তবে অন্যরা কেন আপনাকে বা আমাদের আশপাশের অন্যান্য মানুষদের উপাসনা করে না?

### গ. মানুষ ঈশ্বর হতে পারে না

একই সময়ে একই সত্তা মানুষ এবং ঈশ্বর হতে পারে না। ঈশ্বরের ঐশ্বরিক ক্ষমতা রয়েছে তাই তিনি মানুষ নন। কারণ মানুষের কোন ঐশ্বরিক ক্ষমতা নেই। ঈশ্বরকে যদি মরণশীল হতে হয়, যা মানুষের বৈশিষ্ট্য, তাহলে তিনি আর ঈশ্বর থাকেন না। কারণ ঈশ্বর অবিনশ্বর। পরবর্তীতে সেই মানুষ ঈশ্বর হতে পারে না। কারণ মানুষের পক্ষে ঈশ্বর হওয়া সম্ভব নয়। যদি তা সম্ভব হত তাহলে আমি এবং আপনিও ঐশ্বরিক ক্ষমতা অর্জন করে ঈশ্বরে পরিণত হতে পারতাম। এ কারণেই ঈশ্বর কখনো মানুষের রূপ ধারণ করবেন না বা করতে পারেন না। কুরআন সব ধরনের নরত্বারোপের বিরোধী। নরত্বারোপ অযৌক্তিক।

### ঘ. ঈশ্বর কখনো অনৈশ্বরিক কাজ করবেন না

ইসলাম বলে না যে আল্লাহ্ সবকিছুই করতে পারেন। ইসলাম বলে আল্লাহ্র সব কিছুর ওপর ক্ষমতা রয়েছে। আসুন আমরা উদাহরণের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করি সৃষ্টিকর্তার ঐশ্বরিক ক্ষমতা থাকার কারণেই সৃষ্টিকর্তা কিছু কিছু কাজ করতে পারেন না।

## ১) সৃষ্টিকর্তা/ঈশ্বর কখনো মিথ্যা কথা বলবেন না

ঈশ্বর কেবল ঐশ্বরিক কাজ করে থাকেন। তিনি কোন অনৈশ্বরিক কাজ করেন না। সৃষ্টিকর্তা কখনো মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। তাঁর মিথ্যা কথা বলার বা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রদানের কোনও ইচ্ছাও থাকতে পারে না। ঈশ্বর কখনোই মিথ্যা কথা বলবেন না বা বলতে পারেন না। কারণ মিথ্যা বলা ঈশ্বরের কাজ নয়। যে মুহূর্তে তিনি মিথ্যা কথা বলবেন সে মুহূর্ত থেকে তিনি আর ঈশ্বর থাকবেন না।

## ২) সৃষ্টিকর্তা/ঈশ্বর কখনো অন্যায়-অবিচার করবেন না

সৃষ্টিকর্তা কখনো অন্যায়-অবিচার করতে পারেন না বা কোন অন্যায় কাজ করার বা অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইচ্ছাও পোষণ করতে পারেন না। তিনি কখনোই তা করবেন না এবং তিনি তা করতে পারেন না। কারণ অন্যায়-অবিচার করা স্রষ্টাসুলভ কাজ নয়। পবিত্র কুরআনের ৪ নম্বর সূরা নিসার ৪০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ.

"আল্লাহ্ অণু পরিমাণও জুলুম (অন্যায়-অবিচার) করেন না।"

যে মুহূর্তে তিনি যুলুম বা অন্যায় করবেন, সে মুহূর্ত থেকে তিনি আর ঈশ্বর থাকবেন না। অনুগ্রহ করে বুঝতে চেষ্টা করুন ঈশ্বর একই সাথে ঈশ্বর ও মানব হতে পারেন না!!! সৃষ্টিকর্তার একইসাথে তার ঐশ্বরিক গুণাবলি থাকবে আবার তার সৃষ্টি মানুষের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যও থাকবে তা হতে পারে না।

## ৩. সৃষ্টিকর্তা কোন ভুল করবেন না

নিখুঁত হওয়া সৃষ্টিকর্তার গুণ। তাঁর সৃষ্টি কখনই এ গুণ অর্জন করতে পারে না। আমরা ক্রমাগত উন্নতি করার বা নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা করে যেতে পারি কিন্তু আমরা কখনই নিখুঁত হতে পারব না।

সুতরাং, সৃষ্টিকর্তা কি কখনো ভুল করতে পারেন? তিনি কখনোই ভুল করবেন না বা ভুল করতে পারেন না। মানুষ মাত্রই ভুল আছে। ভুল করা স্রষ্টাসুলভ কাজ নয়। পবিত্র কুরআনের ২০ নম্বর সূরার ত্বহার ৫২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

... لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى.

"...আমার প্রতিপালক কখনো ভুল করেন না, বিস্মৃত হন না।"

যে মুহূর্তে তিনি ভুল করবেন সে মুহূর্তে তিনি আর সৃষ্টিকর্তা থাকবেন না।

### ৪. সৃষ্টিকর্তা কোন কিছু ভোলেন না

সৃষ্টিকর্তা কোন কিছু ভুলে যান না। কারণ ভুলে যাওয়া স্রষ্টাসুলভ কাজ নয়। পবিত্র কুরআনের ২০ নম্বর সূরা ত্বহার ৫২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

..... لاَ يَضِلُّ رَبِّيْ وَلاَ يَنْسٰي.

"...আমার প্রতিপালক ভুল করেন না, বিস্মৃত হন না।"

যে মুহূর্তে সৃষ্টিকর্তা বিস্মৃত হবেন তখন তিনি আর সৃষ্টিকর্তা থাকবেন না।

### ৬. ঈশ্বর কেবল ঐশ্বরিক কাজ করেন

১) আল্লাহর সব কিছুর ওপর ক্ষমতা রয়েছে।

পবিত্র কুরআনের বেশ কিছু জায়গায় বলা হয়েছে, যেমন, সূরা বাকারার ১০৬ নম্বর আয়াত :

انَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

'আল্লাহই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'।

আমাদের বোঝার জন্য ঐশ্বরিক জ্ঞান সম্পর্কিত এই বিবৃতির ওপর আরো বেশ কিছু জায়গায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে :

২ নং সূরা বাকারা : আয়াত ১০৯

২ নং সূরা বাকারা : আয়াত ২৮৪

৩ নং সূরা আলে ইমরান : আয়াত ২৯

১৬ নং সূরা নাহল : আয়াত ৭৭

৩৫ নং সূরা ফাতির : আয়াত ১

### ২. আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন

পবিত্র কুরআনের ৮৫ নম্বর সূরা বুরুজের ১৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ.

" আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।"

এখন আমি নিশ্চিত যে আপনি নিজেই বিনীত ও আন্তরিকভাবে স্বীকার করবেন যে ঈশ্বর কেবল ঐশ্বরিক কাজ করার ইচ্ছাই পোষণ করেন, তিনি কোন অনৈশ্বরিক কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করেন না।

ভুলে যাওয়া, ভুল করা, ক্লান্ত হওয়া, ক্ষুধার্ত হওয়া, ঈর্ষান্বিত হওয়া এবং ঈশ্বরের ওপর এ ধরনের মানবসুলভ গুণাবলি আরোপের মাধ্যমে আপনারা কি বুঝতে পারছেন যে আপনারা সৃষ্টিকর্তাকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন? আপনারা কি মনে করেন আমরা মানুষেরা আল্লাহর ওপর এ ধরনের মানবিক গুণাবলি আরোপের মাধ্যমে ঠিক কাজটি করছি? মূর্খ মানব সৃষ্টিকর্তার ওপর যেসব গুণাবলি আরোপ করে আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে সেসব থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা দেয়াই আমাদের জন্য উত্তম ও সৎ পছন্দ।

পবিত্র কুরআনের ৫৯ নম্বর সূরা হাশরের ২৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

"উহারা যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তাহা হইতে পবিত্র, মহান"।

এভাবে আমরা নবুওয়ত ও আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে যে সাদৃশ্য রয়েছে তা তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থের আলোকে বিশ্লেষণ করলাম ও তুলে ধরলাম। এই বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা ইসলামধর্ম ও হিন্দুধর্মে মৃত্যুর পরের জীবন, ভাগ্য ও অদৃষ্ট বা নিয়তি এবং ইবাদত/প্রার্থনার ধারণার মধ্যে যে সাদৃশ্য রয়েছে তা দেখব।

এখন আমরা দেখব মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সা.) আগমন সম্পর্কে হিন্দুধর্ম গ্রন্থগুলোতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

# ১১

# হিন্দুধর্ম গ্রন্থে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

## ক. মহানবী মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে ভবিষ্য পুরাণে ভবিষ্যদ্বাণী

ভবিষ্য পুরাণে প্রতিসর্গ পর্ব ৩, খণ্ড ৩, অধ্যায় ৩, শ্লোক ৫ থেকে ৮ তে বলা হয়েছে :

"একজন মালেছা (ভিন দেশের ভিন্ন ভাষাভাষী লোক) আধ্যাত্মিক শিক্ষক তাঁর সাথীদের নিয়ে আসবেন, তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ। রাজা (ভোজ) এই মহাদেব আরবকে (স্বর্গীয় গুণাবলি সম্পন্ন) 'পঞ্চগব্য' ও গঙ্গাজলে স্নান করাবার পর (অর্থাৎ সব পাপ থেকে পবিত্র করে) তাকে তার গভীর আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বললেন, "আমি আপনার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করছি, হে মানবজাতির গৌরব, আরববাসী, আপনি শক্তি সংগ্রহ করেছেন শয়তানকে হত্যা করার এবং আপনি নিজেকে মালেছা বিরোধীদের থেকে সুরক্ষিত করেছেন।"

ভবিষ্যদ্বাণীতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে :

১) নবীর নাম মুহাম্মদ

২) সে হবে আরব; সংস্কৃত শব্দ মরুস্থল অর্থ বালুময় জমি বা মরুভূমি

৩) রাসূলের সাথী অর্থাৎ সাহাবাদের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সা.) মত এত বেশি সাহাবি অন্যকোন রাসূলের ছিল না।

৪) তাঁকে মানবজাতির গৌরব (পার্বতিস নাথ) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের ৬৮ নম্বর সূরা কালামের ৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

"এবং তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।"

এবং আবারো ৩৩ নম্বর সূরা আহ্যাবের ২১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

"তাহাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ।"

৫) তিনি শয়তানকে হত্যা করবেন অর্থাৎ মূর্তি পূজা ও সব ধরনের অনাচার নির্মূল করবেন।

৬) তাঁকে (রাসূল) তার শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করা হবে।

কেউ কেউ বলেন, যে রাজা ভোজের কথা ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সা.) আগমনের ৫০০ বছর পরে একাদশ শতকে বেঁচে ছিলেন এবং তিনি রাজা শালিবাহানের ১০ম প্রজন্ম ছিলেন। তারা বুঝতে পারেন না যে ভোজ নামের কেবল একজন রাজাই ছিলেন না। মিশরের রাজাদের ফেরাউন এবং রোমের সম্রাটদের বলা হত সিজার। তেমনি ভারতের রাজাদের ভোজ উপাধি দেয়া হয়েছিল। তাই ১১শ শতকের রাজা ভোজের আগেও আরো অনেক রাজা ভোজ এসেছিলেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বাস্তবে পঞ্চগব্য এবং গঙ্গাজলে স্নান করেননি। যেহেতু গঙ্গার জলকে পবিত্র বলে বিবেচনা করা হয়, তাই গঙ্গার জলে স্নান করা অর্থ সব ধরনের পাপ ধুয়ে ফেলা বা সব ধরনের পাপ থেকে মুক্ত হওয়া। এখানে ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন নিষ্পাপ অর্থাৎ 'মাসুম'।

**খ. ভবিষ্য পুরাণে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী**

ভবিষ্য পুরাণের প্রতিসর্গ পর্ব ৩, খণ্ড ৩, অধ্যায় ৩ শ্লোক ১০ থেকে ২৭ মহাঋষি ব্যাস ভবিষ্যদ্বাণী করেন,

"মালেচ্ছা আরবের সুপরিচিত ভূমিকে নষ্ট করেছে। আর্যধর্ম দেশটিতে পাওয়া যায় না। পূর্বেও একজন পথভ্রষ্টকারীর আবির্ভাব ঘটেছিল যাকে আমি হত্যা করেছি; সে এখন আবারো একজন শক্তিশালী শত্রু কর্তৃক প্রেরিত হয়ে আবির্ভূত হয়েছে। এই শত্রুদের সঠিক পথ ও দিকনির্দেশনা প্রদর্শনের জন্য সুপরিচিত মহামাদ (মুহাম্মদ), যাকে আমি ব্রহ্মার চরিত্রের গুণাবলি প্রদান করেছি, পিশাচদের সঠিক পথে আনতে ব্যস্ত রয়েছেন। হে রাজা, আপনার বোকা পিশাচদের ভূমিতে যাবার প্রয়োজন নেই। আমার দয়ায় আপনি যেখানে আছেন সেখানেই আপনি পবিত্রতা লাভ করবেন। রাত্রিকালে, সেই স্বর্গীয় গুণাবলি সম্পন্ন, বিচক্ষণ ব্যক্তি, অপিশাচের ছদ্মবেশে রাজা ভোজকে বললেন, হে রাজা! আপনার আর্যধর্মকে সব ধর্মের ওপর স্থান দেয়া হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর পরমাত্মার আদেশ অনুসারে, আমি মাংসভোজীদের মজবুত ধর্মবিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করব।

আমার অনুসারীরা হবে খৎনা করা পুরুষ, টিকিবিহীন (তার মাথায়), দাঁড়িওয়ালা, আযানের মাধ্যমে বিপ্লব ঘটাবে এবং সব হালাল জিনিস খাবে। সে শূকর ছাড়া আর সব জন্তুর মাংসই খাবে। তারা পবিত্র গাছগাছড়ার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে চাইবে না, বরং যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তারা পবিত্রতা অর্জন করবে। বিধর্মী জাতিগুলোর সাথে যুদ্ধের সময় তারা মুসলমান নামে পরিচিত হবে। আমি এই মাংসভোজী জাতির ধর্মের প্রবক্তা হব।"

এখন আমরা মৃত্যুর পরের জীবন, ভাগ্য ও অদৃষ্টের ধারণার ক্ষেত্রে মুসলিম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে যে সাদৃশ্য রয়েছে তা দু'টি ধর্মগ্রন্থের আলোকে পর্যালোচনা করব এবং তুলে ধরব।

# ১২

# হিন্দুধর্ম ও ইসলামে মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে ধারণা

## হিন্দুধর্মে মৃত্যুর পরের জীবন

### ১. হিন্দুধর্মে পুনর্জন্মের ধারণা- মৃত্যুর পর আত্মার অন্য দেহে গমন বা পুনর্জন্ম লাভ

অধিকাংশ হিন্দুই জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জন্ম লাভ– এই চক্রে বিশ্বাসী, যাকে বলা হয় 'সংসার'।

'সংসার' বা পুনর্জন্মের মতবাদ জন্মের পর আত্মার অন্য দেহে গমন বা আত্মার পুনরায় দেহ লাভের তত্ত্ব হিসেবেও পরিচিত। এই মতবাদ হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। পুনর্জন্মের মতবাদ অনুসারে, এমনকি মানুষের জন্মের সময় থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্যের কারণ তার পূর্বজন্মের কর্মফল, অর্থাৎ গত জন্মে সে যা করেছে। যেমন, একটি শিশু যদি সুস্থ অবস্থায় জন্মায় এবং আরেকটি শিশু যদি প্রতিবন্ধী বা অন্ধ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, তবে তার কারণ হিসেবে বলা হয় এটি তাদের পূর্বজন্মের কাজের ফল। যারা এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে তারা যুক্তি দেখায় যে যেহেতু এই জীবনে আমরা আমাদের সব কাজের প্রতিফল পাই না তাই একজনের কাজের পরিণতি ভোগ বা সুফল পাবার জন্য অন্য আরেকটি জীবন থাকতে হবে।

ক) ভগবদ্‌গীতার ২:২২-এ বলা হয়েছে,

"মানুষ যেমন পুরানো কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পরে তেমনি আত্মাও পুরোনো ও জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে।"

খ) বৃহদারণ্যক উপনিষদে ৪:৪:৩-তেও পুনর্জন্মের কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে,

"শুঁয়োপোকা যেমন তৃণফলার চূড়ায় উঠলে নতুন তৃণফলায় আশ্রয় নেয় ঠিক তেমনি আত্মা দেহ ছাড়লে নতুন অস্তিত্বে আশ্রয় নেয়।"

### ২. কর্ম-কার্যকারণ বিধি

কর্ম অর্থ হল কাজ, ক্রিয়া, পদক্ষেপ বা কার্যক্রম এবং এ দিয়ে শুধু আমাদের দেহ যে কাজ করে তাই বোঝায় না বরং আমাদের মন যে কাজ করে তাও বোঝায়। কর্মের প্রকৃত অর্থ হল ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বা কার্যকারণ বিধি। একে এই প্রবাদের

মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়, "যেমন কর্ম, তেমন ফল।" একজন কৃষক গম রোপণ করে চাল উৎপাদনের প্রত্যাশা করতে পারে না। তেমনিভাবে প্রতিটি সৎচিন্তা, বাক্য ও কর্ম একই ধরনের ফলাফল দান করে যা আমাদের পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত করে, আবার প্রতিটি নিষ্ঠুর চিন্তা, রূঢ় বাক্য বা পাপ কার্য আমাদের এই জীবনকে বা পরবর্তী জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

### ৩. ধর্ম-ন্যায়নিষ্ঠ কর্তব্যসমূহ

ধর্ম অর্থ হল ন্যায় বা ন্যায়নিষ্ঠ কর্তব্য। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ব্যক্তি, পরিবার, শ্রেণী-বর্ণের এবং বিশ্বের জন্য যা ভালো। ভালো কর্ম লাভের জন্য ধর্ম মতে জীবন পরিচালনা করতে হবে, অন্যথায় আমাদের কর্ম হবে মন্দ। ধর্ম আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় জীবনকেই প্রভাবিত করে।

### ৪. মোক্ষ-পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি

মোক্ষ অর্থ পুনর্জন্ম বা 'সংসার' চক্র থেকে মুক্তি। সব হিন্দুর সর্বশেষ লক্ষ্য হল একদিন পুনর্জন্মের চক্র সমাপ্ত হবে এবং তাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে না। এটি তখনই ঘটবে যখন কোন কর্ম থাকবে না যার কারণে ব্যক্তিকে পুনর্জন্ম লাভ করতে হবে অর্থাৎ যখন ভালো বা খারাপ কোন কর্মই থাকবে না।

### ৫. বেদে পুনর্জন্মের কথা বলা হয়নি

যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল হিন্দুদের সবচেয়ে বিশুদ্ধ ধর্মগ্রন্থ বেদে পুনর্জন্মের তত্ত্বকে স্বীকৃতি দেয়া, সমর্থন করা, এমনকি উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি। মৃত্যুর পর আত্মার অন্য দেহে গমনের পুরো ধারণাটাই বেদে অনুপস্থিত।

### ৬. পুনর্জন্ম অর্থ পুনরায় জন্ম গ্রহণের চক্র নয় বরং মৃত্যুর পরের জীবন

পুনরায় জন্মগ্রহণ বোঝাতে সাধারণত যে শব্দটি ব্যবহার করা হয় তা হল 'পুনর্জন্ম/পুনর্জনম'। সংস্কৃতে 'পুনঃ' বা 'পুন' অর্থ 'পরবর্তীতে' বা 'আবারও' এবং 'জনম/জন্ম' অর্থ 'জীবন'। সুতরাং 'পুনর্জন্ম/পুনর্জনম' অর্থ 'পরবর্তী জীবন' বা 'মৃত্যুর পরের জীবন'। এর অর্থ এই নয় যে আপনি বারবার জীবন লাভ করে পৃথিবীতে ফিরে আসবেন।

মৃত্যুর পরের জীবনের কথা মাথায় রেখে কেউ যদি হিন্দুধর্মগ্রন্থের যেসব স্থানে পুনর্জন্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা অধ্যয়ন করে তাহলে তারা পুনর্জন্ম বা বারবার জীবন লাভ নয় বরং পরবর্তী জীবন সম্পর্কে ধারণাই লাভ করবে।

ভগবদ্গীতা ও উপনিষদের বিভিন্ন স্থানে যে পুনর্জন্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এটি দিয়ে তাই বোঝানো হয়েছে। বৈদিক যুগের পর বারবার জন্মগ্রহণ করা বা পুনরায় জন্ম গ্রহণের এই ধারণাটি গড়ে ওঠে। স্রষ্টা অবিচার করতে পারেন না- এ কথাটি বিবেচনায় রেখে জন্মের সময় মানুষে মানুষে যে পার্থক্য হয় এবং মানুষ যে বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা ও ব্যাখ্যা করার জন্য উপনিষদ, ভগবদ্গীতা ও পূরাণসহ পরবর্তী ধর্মগ্রন্থগুলোতে মানুষ সচেতনভাবেই এই মতবাদকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ মত অনুযায়ী, যেহেতু আল্লাহ্ অবিচার করেন না, তাই মানুষে মানুষে বৈষম্য ও ব্যবধানের কারণ তাদের পূর্বজন্মের কাজের ফল। তবে ইসলামেও এর যৌক্তিক জবাব রয়েছে যা আমরা পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করব ইন্‌শাল্লাহ্ ।

## ৭. বেদে মৃত্যুর পরের জীবন

বেদে মৃত্যুর পরের জীবনের উল্লেখ রয়েছে।

ক. ঋগ্বেদ বই ১০ স্তবক ১৬ শ্লোক ৪

"এ মৃত ব্যক্তির যে অংশ অজ অর্থাৎ জন্মরহিত চিরকালই আছে, হে অগ্নি! তুমি সে অংশকে তোমার তাপ দ্বারা উত্তপ্ত কর, তোমার শিখা সে অংশকে উত্তপ্ত করুক। হে জাতবেদা বহ্নি! তোমার যে সকল শুভকামী সদস্য আছে তাদের দ্বারা এ মৃত্যুকে পুণ্যবান লোকদের ভুবনে বহন করে নিয়ে যাও।"

সংস্কৃত শব্দ 'সুক্রিতামো লোকাম' অর্থ 'পুণ্যবানদের কথা বা পুণ্যবানদের অঞ্চল'। এখানে মৃত্যুর পরের জীবনের কথা বলা হয়েছে।

খ. ঋগ্বেদ বই ১০ স্তবক ১৬ শ্লোক ৫

"... (এই মৃত দেহের) যা অবশিষ্ট আছে তা জীবনপ্রাপ্ত হয়ে উত্থিত হোক, হে জাতবেদা! সে পুনর্বার দেহ লাভ করুক।"

এই শ্লোকেও দ্বিতীয় জীবন তথা মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে।

## ৮. বেদে স্বর্গের প্রসঙ্গ

স্বর্গের কথা বেদের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন,

ক. অথর্ববেদ বই ৪ স্তবক ৩৪ শ্লোক ৬

"দধি, মধু, ঘৃতাদির দ্বারা পূর্ণ রসের ধারা স্বর্গলোকে মাধুর্যের মত সিঞ্চন করে তোমাকে লাভ করুক। ঘৃতাদি দ্রব্যের মধ্যে যা যা কামনা কর, সেগুলির দ্বারা পূর্ণ হয়ে বহুবিধ পুষ্করিণী তোমার সেবা করুক।"

খ. অথর্ববেদ বই ৪ স্তবক ৩৪ শ্লোক ২- এ উল্লেখ আছে,

অমৃতময় শরীর, অতএব অন্তরিক্ষ-সঞ্চারী বায়ুর দ্বারা পবিত্রীকৃত, নির্মল, দীপ্যমান তারা জ্যোতির্ময় ভুবনে গমন করে। স্বর্গালোকে এদের ভোগসাধন তাদের জননেন্দ্রিয়কে অগ্নিদগ্ধ করে না। সুখের এই ভুবনে তাদের ভোগের জন্য বহু স্ত্রীলোক আছে।

গ. অথর্ববেদ বই ২ স্তবক ৩৪ শ্লোক ৫- এ উল্লেখ আছে,

অন্তরিক্ষলোকে স্থিত দেবগণ সর্বপ্রথম তোমার শরীর থেকে নিষ্ক্রান্ত আত্মাকে গ্রহণ করুক। তারপর তুমি দেবগণের দ্বারা পরিগৃহীত হয়ে স্বর্গালোকে যাও এবং সেখানে দিব্য ভোগযোগ্য শরীরে প্রতিষ্ঠিত হও। আলোকিতদের (পূর্বপুরুষদের) পথ ধরে আলো ও মুক্তির জগতে প্রবেশ করো।

ঘ. অথর্ববেদ বই ৬ স্তবক ১২২ শ্লোক ৫- এ উল্লেখ আছে,

তোমরা উভয়ে এই কাজ শুরু করো, একে অর্জনের জন্য দৃঢ় প্রচেষ্টা চালাও। যাদের অগাধ বিশ্বাস আছে তারা এই সুখময় আবাসে গমন করবে। আত্মত্যাগের আগুনে তোমরা যে অঞ্জলিই দাও না কেন তোমরা উভয়ে, স্বামী ও স্ত্রী, এগুলো রক্ষার্থে ঐক্যবদ্ধ থাকো।

ঙ. ঋগ্বেদ বই ১০ স্তবক ৯৫ শ্লোক ১৮- এ উল্লেখ আছে,

হে ইলা! এসকল দেবতা তোমাকে বলছেন যেহেতু তুমি অবশ্যই মারা যাবে, সেহেতু তোমার বংশধরগণ যেন স্বকীয় হোমদ্রব্য দ্বারা দেবতাদের তুষ্ট করে, আর তখনই তুমি স্বর্গে গিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করবে।

**৯. বেদে নরকের প্রসঙ্গ**

নরকের কথাও বেদে বর্ণিত হয়েছে এবং নরক বোঝাতে সংস্কৃতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা হল 'নরকাস্থানম'।

এ বিষয়ে ঋগ্বেদ বই ৪ স্তবক ৫ শ্লোক ৪- তে উল্লেখ আছে।

পূজনীয় ও বিদ্বান প্রভুর বিধিবিধান ও আইনকে যারা অবজ্ঞা করে জাজ্বল্যমান ও তিক্ষ্ণদন্ত অগ্নিশিখা সন্তাপকর তেজ দ্বারা তাদেরকে দগ্ধ করুক।

## ইসলামে মৃত্যুর পরের জীবন

### ১. পৃথিবীতে একবার জন্মলাভ করা এবং তারপর মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ করা

কুরআনের ২ নম্বর সূরা বাকারার ২৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

"তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করিয়াছেন আবার মৃত্যু ঘটাইবেন ও পুনরায় জীবন্ত করিবেন, পরিণামে তাঁহার দিকেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনা হবে।"

ইসলাম বলে মানুষ কেবল একবারই এ পৃথিবীতে জন্ম লাভ করে এবং মৃত্যুর পর শেষ বিচারের দিনে তাকে আবারো জীবন্ত করা হয়। তার কাজের ওপর নির্ভর করে হয় সে জান্নাতে বসবাস করবে আর না হয় সে জাহান্নামে যাবে।

### ২. দুনিয়ার জীবন হচ্ছে আখেরাতের জীবনের জন্য একটি পরীক্ষাক্ষেত্র

কুরআনের ৬৭ নম্বর সূরা মুলকের ২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ.

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন
তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য
কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম;
তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।"

আমরা দুনিয়াতে যে জীবনযাপন করি তা আখেরাতের জীবনের জন্য একটি পরীক্ষা। আমরা যদি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার আদেশ-নির্দেশ মেনে চলি এবং এ পরীক্ষায় পাস করি তাহলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব যেখানে আছে পরম সুখ। আমরা যদি আমাদের সৃষ্টিকর্তার আদেশ-নিষেধ মেনে না চলি এবং এ পরীক্ষায় পাস করতে না পারি তাহলে আমরা জাহান্নামে নিপতিত হব।

### ৩. শেষ বিচারের দিনে কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করা হবে

কুরআনের ৩ নম্বর সূরা আল ইমরানের ১৮৫ আয়াতে বলা হয়েছে :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ

عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ.

"প্রত্যেক আত্মাই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে
কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে তোমাদিগের কর্মফল
পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হইবে
যাহাকে অগ্নি হইতে দূরে রাখা হইবে
এবং জান্নাতে দাখিল করা হইবে সে-ই সফলকাম
এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতিত কিছুই নয়।"

**৪. বেহেশত - আল জান্নাত**

ক. আল জান্নাত অর্থাৎ বেহেশত বা স্বর্গ পরম সুখের জায়গা। আরবিতে জান্নাত শব্দের আভিধানিক অর্থ 'বাগান'। কুরআনে জান্নাতের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে, যেমন বাগান যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। এতে দুধ ও খাঁটি মধুর নদী রয়েছে যার স্বাদ-গন্ধ অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে। জান্নাতে সব ধরনের ফল রয়েছে। সেখানে কেউ কখনো ক্লান্ত বা অবসাদগ্রস্ত হবে না, অলস কথাবার্তাও বলবে না কেউ। সেখানে পাপ করার, সমস্যায়, উদ্বেগে, বিপদে বা দুঃখকষ্টে পড়ার কোন কারণ থাকবে না। জান্নাতে কেবল থাকবে শান্তি আর পরম সুখ।

খ. কুরআনের বেশ কিছু আয়াতে জান্নাতের বর্ণনা দেয়া আছে, যেমনঃ

১. আল কুরআনের ৩ নং সূরা আলে ইমরানের ১৫ নং আয়াত
২. আল কুরআনের ৩ নং সূরা আলে ইমরানের ১৯৮ নং আয়াত
৩. আল কুরআনের ৪ নং সূরা নিসার ৫৭ নং আয়াত
৪. আল কুরআনের ৫ নং সূরা মায়েদার ১১৯ নং আয়াত
৫. আল কুরআনের ৯ নং সূরা তওবার ৭২ নং আয়াত
৬. আল কুরআনের ১৫ নং সূরা হিজরের ৪৫-৪৮ নং আয়াত
৭. আল কুরআনের ১৮ নং সূরা কাফের ৩১ নং আয়াত
৮. আল কুরআনের ২২ নং সূরা হজ্জের ২৩ নং আয়াত
৯. আল কুরআনের ৩৫ নং সূরা ফাতিরের ৩৩-৩৫ নং আয়াত
১০. আল কুরআনের ৩৬ নং সূরা ইয়াসিনের ৫৫-৫৮ নং আয়াত
১১. আল কুরআনের ৩৭ নং সূরা আস-সাফ্ফাতের ৪১-৪৯ নং আয়াত
১২. আল কুরআনের ৪৩ নং সূরা জুখরুফের ৬৮-৭৩ নং আয়াত
১৩. আল কুরআনের ৪৪ নং সূরা দুখানের ৫১-৫৭ নং আয়াত

১৪. আল কুরআনের ৪৭ নং সূরা মুহাম্মদের ১৫ নং আয়াত

১৫. আল কুরআনের ৫২ নং সূরা তুরের ১৭-২৪ নং আয়াত

১৬. আল কুরআনের ৫৫ নং সূরা আর-রাহমানের ৪৬-৭৭ নং আয়াত

১৭. আল কুরআনের ৫৬ নং সূরা ওয়াকিয়ার ১১-৩৮ নং আয়াত

## ৫. দোজখ - জাহান্নাম

দোজখ বা জাহান্নাম নিদারুণ যন্ত্রণার জায়গা যেখানে পাপীরা জাহান্নামের আগুনে পুড়ে ভয়াবহ দুঃখ-যাতনা ও কষ্ট ভোগ করবে। এই আগুনের জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। আরো বলা হয়েছে যতবারই তাদের চামড়া পুড়বে ততবারই তাদেরকে আবার নতুন চামড়া দেয়া হবে যাতে তারা কষ্ট অনুভব করতে পারে। নিম্নলিখিত আয়াতগুলোসহ কুরআনের বেশ কিছু আয়াতে জাহান্নামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে :

১. আল কুরআনের ২ নং সূরা বাকারার ২৪ নং আয়াত

২. আল কুরআনের ৪ নং সূরা নিসার ৫৬ নং আয়াত

৩. আল কুরআনের ১৪ নং সূরা ইবরাহীমের ১৬-১৭ নং আয়াত

৪. আল কুরআনের ২২ নং সূরা হাজ্জের ১৯-২২ নং আয়াত

৫. আল কুরআনের ৩৫ নং সূরা ফাতিরের ৩৬-৩৭ নং আয়াত

## ৬. মানুষে মানুষে পার্থক্যের যৌক্তিক কারণ

হিন্দুধর্মে জন্মের সময় মানুষে মানুষে যে পার্থক্য হয় তার কারণ ব্যাখ্যা করতে অতীত কর্ম বা পূর্বজন্মের কাজের কথা বলা হয়েছে। পুনর্জন্মের কোন যৌক্তিক বা বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই।

ইসলাম এই ধরনের পার্থক্যকে কিভাবে ব্যাখ্যা করে? কুরআনের ৬৭ নম্বর সূরা আল মুলকের ২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ.

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন
তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য
কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম;
তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।"

এই জীবন মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য এক পরীক্ষা।

# ১৩

# হিন্দুধর্ম ও ইসলামে ভাগ্য ও অদৃষ্ট সম্পর্কে ধারণা

### ১. অদৃষ্ট বা নিয়তি সম্পর্কে ধারণা - ইসলামে কদর বা তাকদীর

'কদর' হচ্ছে অদৃষ্ট সম্পর্কে ধারণা। মানব জীবনের কিছু বিষয় আমাদের সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ কর্তৃক আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেমন, কখন এবং কোথায় একজন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে, কোন পরিস্থিতি ও অবস্থার মধ্যে সে জন্মগ্রহণ করবে, কত বছর সে বেঁচে থাকবে এবং কোথায় ও কখন সে মৃত্যুবরণ করবে। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এসব আগে থেকেই নির্ধারণ করে রেখেছেন।

### ২. হিন্দুধর্মে অদৃষ্ট বা নিয়তি সম্পর্কে ধারণা

হিন্দুধর্মে নিয়তি বা ভাগ্য সম্পর্কে ধারণা অনেকটা ইসলাম ধর্মের মতই।

### ৩. বর্তমান অবস্থা একটি পরীক্ষা

কুরআনের বেশ কিছু আয়াতে স্পষ্টতই বলা হয়েছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যদিয়ে পরীক্ষা করেন। কুরআনের ২৯ নম্বর সূরা আনকাবুতের ২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْآ اٰمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُوْنَ.

"মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি' এই কথা বললেই তাহাদিগকে পরীক্ষা না করিয়াই অব্যাহতি দেওয়া হইবে?"

২ নং সূরা বাকারার ২১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاۤءُ وَالضَّرَّاۤءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلاَۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ.

"তোমরা কি মনে কর যে তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করিবে, যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসে নাই? অর্থ-কষ্ট ও দুঃখ ক্লেশ তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছিল এবং তাহারা ভীত ও কম্পিত হইয়াছিল। এমনকি রাসূল এবং তাঁহার সহিত ঈমান আনয়নকারিগণ বলিয়া

উঠিয়াছিল, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসিবে?' জানিয়া রাখ, অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য নিকটে!"

২১ নং সূরা আম্বিয়ার ৩৫ নম্বর আয়াত :

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ.

"জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে; আমি তোমাদের মন্দ ও ভালো দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা ফিরিয়া আসিবে"।

২ নং সূরা বাকারার ১৫৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ.

"আমি তোমাদিগকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করিব। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের"।

৮ নং সূরা আনফালের ২৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

وَاعْلَمُوْآ اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّ اَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

"এবং জানিয়া রাখ যে তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা এবং আল্লাহরই নিকট মহা পুরস্কার রহিয়াছে।"

### ৪. প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার ওপর ভিত্তি করে বিচার করা হবে

প্রতিটি মানুষই এই পৃথিবীতে একটি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যায়। আল্লাহ যাকে যে ধরনের অবস্থা ও আরাম আয়েশের মধ্যে রাখে তার ওপর ভিত্তি করে মানুষে মানুষে পরীক্ষার পার্থক্য হয়ে থাকে। সে অনুসারেই তিনি বিচার করে থাকেন। যেমন একজন পরীক্ষক যদি প্রশ্ন কঠিন করেন তাহলে তিনি সাধারণত খাতা খুব বেশি কড়াকড়ি করে দেখেন না। অন্যদিকে তিনি যদি প্রশ্ন সহজ করেন, তাহলে খাতা কড়াকড়ি করে দেখেন।

তেমনি কিছু মানুষ ধনী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে আবার কিছু মানুষ দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। ইসলাম প্রত্যেক ধনী মুসলমানকে (যার সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ নিসাব পর্যায়ের চেয়ে বেশি, অর্থাৎ ৮৫ গ্রাম সোনার মূল্যের সমপরিমাণ) প্রতি চন্দ্রবর্ষে তার অতিরিক্ত সম্পদের ২.৫% যাকাত (গরীবের পাওনা) দিতে নির্দেশ দিয়েছে। এটিকে ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা বলা হয়। কিছু ধনী ব্যক্তি হয়ত ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দানখয়রাত করেন; কেউ হয়ত যা প্রয়োজন

তার চেয়ে কম করেন; কেউ কেউ হয়ত করেনই না। একজন ধনী ব্যক্তি জাকাতের ক্ষেত্রে পূর্ণ নম্বর পেতে পারে, কম নম্বর পেতে পারে এবং একেবারে শূন্যও পেতে পারে। অন্যদিকে একজন দরিদ্র ব্যক্তি, যার সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের চেয়ে কম সে যাকাতের ক্ষেত্রে পূর্ণ নম্বর পাবে, কারণ তাকে এই বাধ্যতামূলক দান করতে হবে না। যেকোন স্বাভাবিক মানুষই ধনী হতে চাইবে, দরিদ্র হতে চাইবে না। কেউ কেউ ধনীদের প্রশংসা করতে পারে এবং দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারে। তারা জানে না যে, এই অর্থবিত্ত তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে, যদি তারা যাকাত না দেয় এবং এ সম্পদের কারণে তাদের চরিত্র নষ্ট হতে পারে। অন্যদিকে দারিদ্র্য গরীবদেরকে জান্নাতে যাবার রাস্তা সহজ করে দিতে পারে যদি সে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অন্যান্য হুকুম-আহ্‌কাম মেনে চলে। এর বিপরীতটাও সত্য হতে পারে। একজন ধনী ব্যক্তি তার দানশীলতা ও মানবতার কল্যাণের কারণে জান্নাতে যেতে পারে, অন্যদিকে যে দরিদ্র ব্যক্তি বিলাসিতার আকাঙ্ক্ষা করে এবং বিলাসিতার সামগ্রী পাবার জন্য অসদুপায় অবলম্বন করে সে শেষ বিচারের দিনে সমস্যায় পড়তে পারে।

### ৫. প্রতিবন্ধী শিশুদের মাধ্যমে তাদের পিতামাতাকে পরীক্ষা করা হয়

কিছু কিছু শিশু সুস্থ অবস্থায় আবার কিছু শিশু প্রতিবন্ধী অবস্থায় বা জন্মগত ব্যাধি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। একজন শিশু সুস্থ বা প্রতিবন্ধী যে অবস্থায়ই জন্মগ্রহণ করুক না কেন ইসলামের দৃষ্টিতে সে মাসুম বা নিষ্পাপ। শিশুটির 'কোন পূর্বজন্মের' পাপের বোঝার কারণে প্রতিবন্ধী হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এই ধরনের বিশ্বাস অন্যদের মধ্যে সহানুভূতির মনোভাব গড়ে তুলবে না। অন্যরা বলতে পারে শিশুটি তার জন্মগত ব্যাধি বা প্রতিবন্ধী অবস্থার জন্য দায়ী। এটি তার "মন্দ কর্মে"র ফল।

ইসলাম বলে এই প্রতিবন্ধী হওয়া তাদের পিতামাতাদের জন্য একটি পরীক্ষা, এরপরও কি তারা সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ? তারা কি ধৈর্য ধারণ করতে পেরেছে? তারা কি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে?

একটি বিখ্যাত প্রবাদ রয়েছে, এক ব্যক্তি দুঃখ করছিল যে, তার কোন জুতা নেই এবং একসময় দেখতে পেল যে একজন লোককে যার পা-ই নেই।

কুরআনের ৮ নম্বর সূরা আনফালের ২৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

وَاعْلَمُوٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّ اَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

**"এবং জানিয়া রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা এবং আল্লাহরই নিকট মহাপুরস্কার রহিয়াছে।"**

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) পরীক্ষা করতে পারেন যে পিতামাতা এরপরও সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ আছেন কি-না। হতে পারে পিতামাতা ন্যায়-নিষ্ঠ ও ধার্মিক, আর তাই জান্নাতে যাবার যোগ্য হতে পারেন। যদি তিনি তাদেরকে জান্নাতের আরো উচ্চতর স্থানে স্থান দিতে চান, তাহলে তিনি তাদেরকে আরো পরীক্ষা করবেন, হয়ত একটি প্রতিবন্ধী শিশু প্রদানের মাধ্যমে। যদি তারা তারপরও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে, তাহলে তারা আরো বড় পুরস্কার পাবার অর্থাৎ জান্নাতুল ফেরদৌস পাবার যোগ্য।

এই রকম একটি সাধারণ নিয়ম রয়েছে যে পরীক্ষা যত কঠিন হবে পুরস্কারও তত বড় হবে। কলা ও বাণিজ্যে স্নাতক পাস করা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং আপনি যদি পাস করেন তাহলে আপনাকে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক ডিগ্রিধারী বলা হবে কিন্তু আপনার নামের সাথে কোন বিশেষ টাইটেল/পদবী যুক্ত করা হবে না। কিন্তু আপনি যদি মেডিসিনে গ্র্যাজুয়েশন করেন তাহলে যেহেতু সেখানে পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়, তাই এতে আপনি গ্র্যাজুয়েট হবার পাশাপাশি আপনাকে ডাক্তার বলে ডাকা হয় এবং আপনার নামের প্রথমে ডা. উপাধি থাকে।

একইভাবে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বিভিন্ন জনকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। কাউকে স্বাস্থ্য দিয়ে, কাউকে সম্পদ দিয়ে, কাউকে দারিদ্র্য দিয়ে, কাউকে বেশি মেধা দিয়ে, কাউকে কম মেধা দিয়ে, মানুষকে তিনি যে ধরনের সুবিধা দেন, সে অনুসারেই তার পরীক্ষা নেন।

সুতরাং মানুষে মানুষে পার্থক্যের প্রধান কারণ হলো পরকালের জন্য পরীক্ষা। মৃত্যুর পরের জীবনের কথা কুরআন ও বেদ উভয় স্থানেই বলা হয়েছে।

মানুষে মানুষে পার্থক্যের কারণ আত্মার এক দেহ থেকে অন্য দেহে গমন বা 'সংসারের' অতীত পাপ নয়। এই বিশ্বাস উপনিষদ, ভগবদ্গীতা এবং পুরাণের মত পরবর্তী ধর্মগ্রন্থগুলোতে সংযুক্ত করা হয়েছে। বারবার জন্ম ও মৃত্যুবরণের এই চক্রের কথা বৈদিক যুগে ছিল অজানা ও অশ্রুত।

এখন আমরা হিন্দুধর্ম ও ইসলামে ইবাদত ও জিহাদের ধারণার মধ্যে যে সাদৃশ্য রয়েছে তা ধর্মগ্রন্থগুলোর শিক্ষার আলোকে অধ্যয়ন করব, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব এবং তুলে ধরব।

# ১৪
# হিন্দুধর্ম ও ইসলামে ইবাদত বা উপাসনার ধারণা

**ইসলামের ৫টি স্তম্ভ**

## ১. ইসলামের মূলনীতি

**ক.** সহীহ বুখারির ১ম খণ্ড, ঈমান সম্পর্কিত পাঠের ১ম অধ্যায়, ৮ নম্বর হাদীসে বলা হয়েছে :

ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু বা সংক্ষেপে রা.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, ইসলাম (নিম্নলিখিত) ৫টি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত :

১. সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য (ইলাহ) নেই এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল;

২. সালাত কায়েম করা;

৩. জাকাত দেয়া;

৪. রমজান মাসে সাওম পালন করা (পানাহার না করা বা রোজা রাখা) ও

৫. হজ্জ পালন করা (মক্কায় হজ্জে যাওয়া)

**খ. বিশ্বাসের সাক্ষ্য**

ইসলামি বিশ্বাসের প্রথম স্তম্ভ হল আল্লাহ ছাড়া ইবাদত করার, আনুগত্য প্রদর্শনের, নিজেকে সমর্পণের আর কেউ নেই এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর (সর্বশেষ ও চূড়ান্ত) রাসূল একথা ঘোষণা করা এবং সাক্ষ্য দেয়া। ইসলামি বিশ্বাসের এই স্তম্ভকে ঈমানের স্তম্ভ হিসেবে ইতোমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে।

## ২. সালাত

**ক. ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ হলো সালাত**

সালাতকে সাধারণত ইংরেজিতে 'প্রেয়ার' [Prayer] হিসেবে অনুবাদ করা হয়। 'প্রে' [Pray] অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা। সালাত দিয়ে আমরা মুসলমানেরা শুধুমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করাই বুঝাই না, বরং আমরা তার প্রশংসা করা এবং তার কাছ থেকে পথনির্দেশনা লাভ করাকেও বুঝাই। আমি ব্যক্তিগতভাবে একে ন্যায়ের দিকে ধাবিত হওয়া হিসেবে বর্ণনা

করতে পছন্দ করি। বিস্তারিত বলতে গেলে সালাতের সময় সূরা ফাতিহার পর ইমাম পবিত্র কুরআনের ৫ নম্বর সূরা মায়িদার ৯০ নম্বর আয়াতটি পাঠ করতে পারেন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর-যাহাতে সফলকাম হইতে পার।"

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) কুরআনের এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদের নির্দেশনা প্রদান করছেন। সেটি ইমাম সালাতের সময় পাঠ করছেন যে আমাদের মাতাল হওয়া, জুয়া খেলা, মূর্তি পূজা করা বা ভাগ্য গণণা করা উচিত না। এই সবই শয়তানের কাজ এবং আমরা যদি উন্নতি করতে চাই তাহলে আমাদের এসব থেকে দূরে থাকা উচিত। ইংরেজি শব্দ 'প্রেয়ার'-এর মাধ্যমে সালাত শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ ও প্রকৃত অর্থে প্রকাশিত হয় না।

### খ. সালাত আপনাকে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে

কুরআনের ২৯ নম্বর সূরা আনকাবুতের ৪৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ط اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

"তুমি পড় কিতাব হইতে যাহা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয় এবং সালাত কায়েম কর। সালাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হইতে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা জানেন।"

### গ. বিশুদ্ধ আত্মার জন্য ৫ বার সালাত আদায়

সুস্বাস্থ্যের জন্য একজন মানুষের তিনবার খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। একইভাবে সুস্থ আত্মার জন্য আমাদের প্রতিদিন অন্তত পাঁচবার সালাত আদায় করা উচিত। আল কুরআনের ১৭ নং সূরা ইসরার ৭৮ নম্বর আয়াতে এবং ২০ নং সূরা ত্বহার ১৩০ নম্বর আয়াতে আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মানুষের জন্য দিনে কমপক্ষে ৫ বার সালাত আদায়ের কথা বলেছেন।

### ঘ. সালাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সিজদা

সালাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল 'সিজদা' অর্থাৎ আত্মসমর্পণ।

১. কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে :

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ.

"হে মারইয়াম! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সিজদা কর এবং যাহারা রুকু 'করে তাহাদের সহিত রুকু' কর।" (সূরা নং ৩, আলে ইমরান, আয়াত নম্বর ৪৩)

২. কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু' কর, সিজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের 'ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর, যাহাতে সফলকাম হইতে পার।" (আল কুরআন : সূরা নং ২২, হাজ্জ, আয়াত নম্বর ৭৭)

## হিন্দুধর্মের সাথে সাদৃশ্য

### হিন্দুধর্মের উপাসনাগুলোর মধ্যে একটি হল 'ষাষ্টাঙ্গ'

হিন্দুধর্মের বিভিন্ন ধরনের ও পদ্ধতির উপাসনা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে 'ষাষ্টাঙ্গ'। 'ষাষ্টাঙ্গ' শব্দটি গঠিত হয়েছে 'ষা' ও 'আষ্ট' যার অর্থ 'আট' এবং 'অং' থেকে যার অর্থ 'শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ'। তাই 'ষাষ্টাঙ্গ' অর্থ শরীরের আটটি অঙ্গ স্পর্শ করার মাধ্যমে প্রার্থনা করা। মুসলমানেরা সালাতে যেভাবে কপাল, নাক, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের পাতা স্পর্শ করে সিজদা করে তাই হচ্ছে এ ধরনের উপাসনা করার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পন্থা।

### হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ

ক) মূর্তিপূজা হিন্দুধর্মে নিষিদ্ধ, যদিও হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সচরাচর মূর্তিপূজা করতে দেখা যায় । ভগবদ্‌গীতার ৭ নং অধ্যায়ের ২০ নং শ্লোকে বলা হয়েছে :

"জাগতিক আকাঙ্ক্ষা যাদের জ্ঞানবুদ্ধিকে চুরি করেছে তারাই মানুষের গড়া স্রষ্টা অর্থাৎ মূর্তি পূজা করে।"

খ) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৪ নং অধ্যায়ের ১৯ নং শ্লোকেও এ বিষয়ে বলা হয়েছে।

গ) যজুর্বেদের ৩২ নং অধ্যায়ের ৩নং শ্লোকে বলা হয়েছে–

"তাঁর কোন আকৃতি নেই"

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪:১৯। যজুর্বেদ ৩২:৩)

ঘ) যজুর্বেদের ৪০ নং অধ্যায় ৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে–

"তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে যারা প্রাকৃতিক বস্তু (যেমন, বায়ু, পানি, আগুন) পূজা করে। তারা অন্ধকারের আরো গভীরে ডুবে যায় যারা সামভূতি অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তু (যেমন, টেবিল, চেয়ার, গাড়ি, মূর্তি) পূজা করে।"

**৩. জাকাত (গরীবের হক)**

**ক. জাকাত অর্থ পবিত্রতা ও প্রবৃদ্ধি**

জাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ, যার অর্থ পবিত্রতা ও প্রবৃদ্ধি।

**খ. ২.৫% দান করা**

প্রত্যেক ধনী (সামর্থ্যবান) মুসলমানকে যার সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ 'নিসাবের' চেয়ে বেশি অর্থাৎ ৮৫ গ্রাম সোনা বা তার সমমূল্য পরিমাণ তার অতিরিক্ত সম্পদের ২.৫% প্রত্যেক চন্দ্রবর্ষে দান করতে হবে।

**গ. যদি সব ধনীরাই জাকাত দেয় তাহলে কোন মানুষ ক্ষুধায় মারা যাবে না।**

যদি সব বিত্তশালী মানুষই জাকাত দেয় তাহলে এ পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য নির্মূল হয়ে যাবে। কোন মানুষই তখন ক্ষুধায় মারা যাবে না।

**ঘ. সম্পদ যেন কেবল ধনীদের হাতে কুক্ষিগত না থাকে জাকাত তা নিশ্চিত করে**

কুরআনের ৫৯ নম্বর সূরা আল হাশরের ৭ নম্বর আয়াতে জাকাত প্রদানের কয়েকটি কারণের মধ্যে একটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে :

...كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.....

"...যাহাতে তোমাদের মধ্যে যাহারা বিত্তবান কেবল তাহাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য (সম্পদ) আবর্তন না করে।..."

**ঙ. হিন্দুধর্মে দান**

হিন্দুধর্মেও দানের কথা বলা হয়েছে।

ক) ঋগ্বেদ ১০ নং বই মন্ত্র ১১৭ শ্লোক ৫ (রালফ গ্রিফিথের অনুবাদ)

"বিত্তশালীদের দরিদ্র ভিখারীদের দান করা উচিত এবং দীর্ঘপথের দিকে দৃষ্টি অবনত করা উচিত। বিত্তশালী এখন একজন, এরপর হবেন অন্য একজন এবং গাড়ির চাকার ন্যায় সবসময় ঘুরতে থাকে।"

"প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির কাছ থেকেই আশা করা হয় তারা দরিদ্র ভিখারীদের সাহায্য করবে। ধনী ব্যক্তির দূরদৃষ্টি থাকতে হবে (কারণ আজকে যে ধনী কাল সে ধনী নাও থাকতে পারে)। মনে রাখবে, ধন-সম্পদ একজন থেকে আরেকজনে ঘোরে ঠিক যেমন রথের চাকা যেভাবে ঘোরে।"

(সত্যপ্রকাশ স্বরসতি এবং সত্যকাম বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক অনূদিত) (ঋগ্বেদ ১০:১১৭:৫)

খ) ভগবদ্‌গীতার বেশ কয়েকটি স্থানে দানের কথা বলা হয়েছে :

অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২০ এবং অধ্যায় ১৬ শ্লোক ৩

## ৪. সাওম - রোজা

### ক. বিবরণ

'সাওম' বা 'উপবাস' ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ। প্রত্যেক সুস্থ প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানকে রমজান মাসে (চন্দ্রমাস) সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

### খ. আত্মসংযমের জন্য পানাহার ত্যাগের কথা বলা হয়েছে

কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৩ নম্বর আয়াতে পানাহার ত্যাগের কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

"হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হইল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে তোমরা মুত্তাকী হইতে পার।"

আজকের দিনে মনোবিজ্ঞানীরা আমাদেরকে অবহিত করছেন যে কোন মানুষ যদি ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাহলে সে তার অধিকাংশ ইচ্ছাকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

### গ. সাওম মাদকগ্রহণ, ধূমপান এবং অন্যান্য আসক্তিকে নিরুৎসাহিত করে

পুরো এক মাস সিয়াম পালনের মাধ্যমে মানুষ তার বদভ্যাসগুলো ত্যাগ করার

একটি ভালো সুযোগ পায়। কোন ব্যক্তি যদি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মদ পান না করে থাকতে পারে, তাহলে সে দিনের ২৪ ঘণ্টাও মদ না পান করে থাকতে পারবে। কোন ব্যক্তি যদি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ধূমপান না করে থাকতে পারে, তাহলে সে দোলনা থেকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত ধূমপান না করে থাকতে পারবে।

**ঘ. চিকিৎসাগত উপকার**

সাওমের চিকিৎসা বা মেডিক্যালগত অনেক উপকার আছে। সিয়াম অন্ত্রের শোষণ বৃদ্ধি করে এবং কোলেস্টরেল লেভেল কমায়।

**ঙ. হিন্দুধর্মে উপবাস**

হিন্দুধর্মে বিভিন্ন ধরনের ও পদ্ধতির উপবাস রয়েছে। মনুস্মৃতি অধ্যায় ৬ শ্লোক ২৭ মতে, বিশুদ্ধতা অর্জনের জন্য একমাস উপবাস পালনের কথা বলা হয়েছে।

(ড. আর.এন. শর্মা সম্পাদিত মনুস্মৃতি)

উপবাসের কথা বলা হয়েছে মনুস্মৃতি অধ্যায় ৪ শ্লোক ২২২ এবং মনুস্মৃতি অধ্যায় ১১ শ্লোক ২০৪-এ।

## ৫. হজ্জ

**ক. বিবরণ**

হজ্জ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। হজ্জ করতে সামর্থ্যবান প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমকে জীবনে অন্তত একবার হজ্জ পালন করতে হবে।

**খ. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব**

হজ্জ বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের একটি বাস্তব উদাহরণ। হজ্জ বিশ্বের সবচেয়ে বড় জমায়েত যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ– যেমন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত এবং অন্যান্য দেশ থেকে প্রায় ২৫ লাখ মানুষ জমায়েত হয়। প্রত্যেক হজ্জযাত্রীই প্রধানত সাদা রংয়ের দুই খণ্ড সেলাই ছাড়া কাপড় পরিধান করে যাতে ধনী-দরিদ্র, বাদশা-ফকিরের মধ্যে কোন ভেদাভেদ না থাকে। সব বর্ণ ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষ একমাত্র সৃষ্টিকর্তার ইবাদতের জন্য একত্রিত হয়।

**গ. হিন্দুধর্মে তীর্থযাত্রা**

হিন্দুধর্মে তীর্থযাত্রার বিভিন্ন স্থান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি পবিত্র স্থানের কথা উল্লেখ আছে–

১. ঋগ্বেদ, পুস্তক ৩ মন্ত্র ২৯ শ্লোক ৪

"ইলাস্পাদ, যা নভ প্রাথবিতে রয়েছে"

'ইলা' অর্থ সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহ এবং 'স্পাদ' অর্থ স্থান। সুতরাং ইলাস্পাদ অর্থ সৃষ্টিকর্তার স্থান। নভ অর্থ কেন্দ্র এবং প্রাথবি অর্থ পৃথিবী। সুতরাং বেদের এই শ্লোকে পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত সৃষ্টিকর্তার স্থানের কথা বলা হয়েছে।

এম. মনিয়ার উইলিয়ামের সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানে (সংস্করণ ২০০২) ইলাস্পাদ বলতে 'তীর্থের নাম' অর্থাৎ তীর্থ স্থানের নাম বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এটি কোথায় অবস্থিত সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করা হয়নি। (শুধুমাত্র বলা হয়েছে পৃথিবীর কেন্দ্রে)।

২. পবিত্র কুরআনের ৩ নম্বর সূরা আল ইমরানের ৯৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ.

"নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতো বাক্কায়, উহা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী।"

'বাক্কা' মক্কার আরেকটি নাম এবং আজকের দিনে আমরা জানি যে মক্কা পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত।

সপ্তম শ্লোকের পর :

৩. ঋগ্বেদ বই ৩ মন্ত্র ২৯ শ্লোক ১১ তে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে 'নরসংশ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, ঋগ্বেদে যে ইলাস্পাদ বা তীর্থ স্থানের কথা বলা হয়েছে তা আসলে মক্কা।

৪. ঋগ্বেদের বই ১ মন্ত্র ১২৮ শ্লোক ১ মক্কাকে ইলাস্পাদ অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র স্থান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

# ১৫
# ইসলাম ও হিন্দুধর্মে জিহাদের ধারণা

কেবলমাত্র অমুসলিম নয়, মুসলমানদের মধ্যেও ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাগুলোর অন্যতম হচ্ছে জিহাদ সম্পর্কে ধারণা। মুসলিম ও অমুসলিম উভয়েই মনে করে, কোন মুসলমান, ভালো বা মন্দ, যে উদ্দেশ্যেই কোনো যুদ্ধ করুক না কেন তাকে জিহাদ বলা হবে।

'জিহাদ' একটি আরবি শব্দ, যার উৎপত্তি 'জাহাদা' শব্দ থেকে, যার আভিধানিক অর্থ প্রচেষ্টা চালানো বা সংগ্রাম করা।

উদাহরণস্বরূপ, কোন শিক্ষার্থী যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য চেষ্টা করে তাহলে সে 'জিহাদ' করছে।

ইসলামে 'জিহাদ' অর্থ নিজের খারাপ বা মন্দ চিন্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। সমাজকে ভালো করার চেষ্টাকেও জিহাদ বলা হয়। আত্মরক্ষার্থে বা যুদ্ধক্ষেত্রে শোষণ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও জিহাদের আরেকটি অর্থ।

### ১. জিহাদ ধর্মযুদ্ধ নয়

শুধু অমুসলিম পণ্ডিত নয়, কিছু কিছু মুসলিম পণ্ডিতও 'জিহাদ'-কে ধর্মযুদ্ধ বলে ভুল ব্যাখ্যা/অনুবাদ করেন। আরবিতে 'ধর্মযুদ্ধ'-কে বলা হয় 'হারবুম মুকাদ্দাসা', আর কুরআন-হাদিসের কোন স্থানেই এই শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। খ্রিস্টানদের ক্রুসেডের বিবরণ দেয়ার সময় 'ধর্মযুদ্ধ' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়, যেখানে খ্রিস্টধর্মের নামে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। আজকের দিনে 'জিহাদ'কে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করতে 'ধর্মযুদ্ধ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অথচ 'জিহাদ' অর্থ 'সংগ্রাম করা বা প্রচেষ্টা চালানো'। ইসলামে জিহাদ অর্থ 'ন্যায়ের জন্য আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করা' অর্থাৎ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

### ২. অনেক ধরনের জিহাদের মধ্যে একটি হল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা

বিভিন্ন ধরনের জিহাদ বা সংগ্রাম রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি হল যুদ্ধক্ষেত্রে নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

'অরুণ শোরি'সহ ইসলামের অনেক সমালোচক কুরআনের ৯ নম্বর সূরা তওবার ৫ নম্বর আয়াতের উল্লেখ করেন :

...فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ...

"...মুশরিক/কাফির (হিন্দু) যেখানে পাইবে হত্যা করিবে..."

আপনি কুরআন পড়লে এই আয়াতটি দেখতে পাবেন, কিন্তু অরুণ শোরি এর প্রেক্ষিত উল্লেখ না করে শুধু আয়াতটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

পাঁচ নম্বর আয়াতের আগের কয়েকটি আয়াতে মক্কার মুসলিম ও মুশরিকদের (মূর্তিপূজারী) মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে। মক্কার মুশরিকরা একপক্ষীয়ভাবে এই শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করেছিল। পাঁচ নম্বর আয়াতে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) চারমাস সময়ের মধ্যে সবকিছু ঠিকঠাক করার জন্য তাদেরকে চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেন, নতুবা যুদ্ধের মোকাবেলা করার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ যুদ্ধের ময়দানে বলেন, "মুশরিকদের (মক্কার শত্রুদের) যেখানে পাইবে হত্যা করিবে, তাহাদিগকে বন্দী করিবে, অবরোধ করিবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাহাদের জন্য ওঁৎ পাতিয়া থাকিবে।"

এই আয়াতে মুসলমানদের যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করার এবং যেখানেই শত্রুদেরকে পাবে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এটা খুবই স্বাভাবিক যে কোন সেনাপ্রধান (আর্মি জেনারেল) তার সৈন্য বাহিনীর মনোবল চাঙ্গা করার জন্য এবং তাদেরকে উদ্দীপিত করার জন্য বলবে "ভয় পেও না, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানেই তাদেরকে পাও তাদেরকে হত্যা কর।" অরুণ শোরি তার বই 'দি ওয়ার্ল্ড অব ফতোয়াজ'-এ সূরা তওবার ৫ নম্বর আয়াতের পর ৭ নম্বর আয়াতের উল্লেখ করেছেন। যে কোন যুক্তিবাদী মানুষই বুঝতে পারবেন যে ৬ নম্বর আয়াতে তার অভিযোগের জবাব রয়েছে।

সূরা তওবার ৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ.

"মুশরিকদের (অর্থাৎ শত্রুদের) মধ্যে কেহ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তাহাকে আশ্রয় দিবে যাহাতে সে আল্লাহর বাণী শুনিতে পায়, অতঃপর তাহাকে তাহার নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিবে।"

আজকের দিনে সবচেয়ে দয়ালু সেনাপ্রধানও হয়ত তার সৈন্যবাহিনীকে শত্রুকে ছেড়ে দেয়ার কথা বলতে পারেন, কিন্তু কুরআনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন, শত্রু যদি শান্তি চায় তবে তাকে কেবল ছেড়ে দেবে তাই নয় তাকে পাহারা দিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবে। আজকের দিনের বা এই যুগে বা সমগ্র মানব ইতিহাসে এমনকি কোন সেনাপ্রধান ছিলেন, যিনি এতখানি উদার নির্দেশ প্রদান

করেছেন? এখন কি কেউ জনাব অরুণ শোরিকে জিজ্ঞাসা করবেন কেন তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ৬ নম্বর আয়াতের উল্লেখ করেননি?

### ৩. ভগবদ্‌গীতায় জিহাদ (সংগ্রাম)

সকল প্রধান ধর্মে ভালো কাজের জন্য তাদের অনুসারীদের সংগ্রাম বা আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাতে বলেছে। ভগবদ্‌গীতা ২:৫০ এ উল্লেখ রয়েছে,

"সেজন্য হে অর্জুন, যোগের জন্য সংগ্রাম করো, যা সব কাজের কলা।"

### ৪. ভগবদ্‌গীতায় যুদ্ধের কথাও বলা হয়েছে

ক) পৃথিবীর সকল প্রধান ধর্মেই কোন না কোন সময়ে বিশেষত আত্মরক্ষার জন্য এবং শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে।

মহাভারত একটি মহাকাব্য এবং হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে প্রধানত দুই (চাচাত) ভাই, পাণ্ডব ও কৌরবয়ের মধ্যে যুদ্ধের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অর্জুন যুদ্ধ ও হত্যা পছন্দ করছিল না, বরং তার বিবেক তার আত্মীয়দের মৃত্যুতে ভারাক্রান্ত হচ্ছিল। সেই মুহূর্তে যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দেন এবং ভগবদ্‌গীতায় সেই পরামর্শের কথা উল্লেখ রয়েছে। ভগবদ্‌গীতায় এমন অনেক উক্তি রয়েছে যেখানে অর্জুন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও তাদেরকে হত্যা করতে উপদেশ দিয়েছে যদিও তারা ছিল তার আত্মীয়।

খ) ভগবদ্‌গীতার ১ম অধ্যায় শ্লোক ৪৩-৪৬ এ বলা হয়েছে–

৪৩) হে কৃষ্ণ, মানুষের সুশৃঙ্খলাবিধানকারী, আমি শিষ্যের উত্তরাধিকারের কাছ থেকে শুনেছি যে যারা পারিবারিক ঐতিহ্য ধ্বংস করে তারা চিরকাল নরকবাস করে।

৪৪) হায়, এটা কি অদ্ভুত ব্যাপার যে রাজকীয় সুখ উপভোগের মোহ দ্বারা তাড়িত হয়ে বিরাট পাপকার্য করার জন্য আমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করছি।

৪৫) ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা নিরস্ত্র ও অপ্রতিরোধ্য অবস্থায় আমাকে হত্যা করার চেয়ে আমি বরং ভালো মনে করি তাদের সাথে লড়াই করা।

৪৬) এভাবে বলে অর্জুন তার তীর-ধনুক পাশে রেখে রথের ওপর বসল, আর তার মন দুঃখে ভারাক্রান্ত ছিল।

গ) ভগবদ্‌গীতার অধ্যায় ২ শ্লোক ২.৩ এ কৃষ্ণ উত্তর দিচ্ছে–

২) আমার প্রিয় অর্জুন, কিভাবে এসব অপবিত্রতা তোমার ওপর ভর করল? যারা জীবনের প্রগতিবাদী মূল্যবোধ সম্পর্কে জানে এগুলো তাদের জন্য উপযুক্ত নয়। এসব উচ্চস্থানে ধাবিত করে না বরং কুখ্যাতি আনে।

৩) হে পার্থের পুত্র, এই অবমাননাকর কাপুরুষতা লালন করো না। এটা তোমার উপযুক্ত নয়। মনের এসব ক্ষুদ্র দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলো এবং ওঠে দাঁড়াও, হে শত্রু-সংহারী।

যখন অর্জুন নিজের (চাচাতো) ভাই কৌরবকে হত্যা করার চেয়ে নিরস্ত্র ও কোনরূপ প্রতিরোধ ছাড়াই মৃত্যুবরণকে শ্রেয় মনে করছিল, তখন কৃষ্ণ তার উত্তরে বলেছিল কিভাবে এই পাপ চিন্তা তার মনে আসল যা তাকে স্বর্গে প্রবেশ থেকে বিরত রাখবে। এই কাপুরুষতা ও দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে জেগে ওঠ, হে শত্রু-সংহারী।

ঘ) ভগবদ্‌গীতার ২ নং অধ্যায়ে ৩১-৩৩ শ্লোকে কৃষ্ণ আরো বলেছেন–

৩১) ক্ষত্রিয় হিসেবে তোমার সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব বিবেচনা করে তোমার জানা উচিত যে ধর্মীয় মূলনীতির জন্য লড়াই করার চেয়ে আর ভালো সম্পৃক্ততা নেই। সুতরাং দ্বিধার কোনো প্রয়োজন নেই।

৩২) হে পার্থ, ক্ষত্রিয়রা কত সৌভাগ্যবান যে লড়াই করার এমন সুযোগ তাদের এসেছে, যা তাদের জন্য স্বর্গীয় ভুবনের দ্বার খুলে দিয়েছে।

৩৩) যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না করো, তাহলে দায়িত্ব অবহেলার জন্য তোমার অবশ্যই পাপ হবে এবং এভাবে তুমি যোদ্ধা রূপে তোমার খ্যাতি হারাবে।

ঙ) ভগবদ্‌গীতার শত শত শ্লোকে যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডকে উৎসাহিত করা হয়েছে যা কুরআনে এ ধরনের আয়াতের চেয়ে অনেক বেশি।

কল্পনা করুন কেউ যদি প্রেক্ষাপট উল্লেখ না করে বলে যে ভগবদ্‌গীতায় স্বর্গ লাভের জন্য পরিবারের সদস্যদের হত্যা করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে, তাহলে এ ধরনের কাজ হবে শয়তানি চিন্তার শামিল। কিন্তু প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে আমি যদি বলি যে সত্য ও ন্যায়ের জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক, এমনকি তা যদি তোমার পরমাত্মীয়ও হয়, তাহলেও এর অর্থ সহজে বোঝা যাবে।

আমি অবাক হই কিভাবে ইসলামের সমালোচকরা বিশেষত হিন্দু সমালোচকেরা কুরআনে যখন অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ও তাদেরকে হত্যা করার কথা বলা হয়, সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। এর একমাত্র সম্ভাব্য কারণ যা আমি চিন্তা করতে পারি তা হল, তারা নিজেরাই তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ যেমন ভগবদ্‌গীতা, মহাভারত এবং বেদ পড়েননি।

চ) হিন্দু সমালোচকেরাসহ ইসলামের অন্যান্য সমালোচকরা কুরআন ও মহানবী (সা.) জিহাদ অর্থাৎ সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করলে জান্নাত লাভের প্রতিশ্রুতি দেয়ায় তার বিরুদ্ধাচারণ করেন।

কুরআনের আয়াত ছাড়াও তারা সহীহ বুখারির ৪র্থ খণ্ডে, জিহাদ সম্পর্কিত পাঠ-এর ২ নম্বর অধ্যায়ের ৪৬ নম্বর হাদীসের উল্লেখ করেন,

"আল্লাহ নিশ্চয়তা দিচ্ছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে স্থান দেবেন, অন্যথায় তিনি সেই ব্যক্তিকে পুরস্কার ও গনিমতের মালসহ নিরাপদে বাড়ি ফিরিয়ে দেবেন।"

ভগবদ্‌গীতায় এমন অনেক শ্লোক রয়েছে যেখানে যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করলে স্বর্গলাভের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। নিচে ভগবদ্‌গীতার ২ নং অধ্যায়ের ৩৭ নং শ্লোকের উল্লেখ করা হল:

"হে কুন্তির পুত্র, যুদ্ধের ময়দানে তুমি নিহত হলে স্বর্গ লাভ করবে, অথবা তুমি ভূ-রাজত্ব জয় করে তা উপভোগ করবে, সুতরাং উঠে দৃঢ়তার সাথে লড়াই করো।"

ছ) একইভাবে ঋগ্বেদের ১ নং অধ্যায়ের মন্ত্র ১৩২ শ্লোক ২-৬ এবং হিন্দুধর্ম গ্রন্থগুলোর আরো অনেক জায়গায় যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে।

### ৫. অন্যান্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে উল্লেখের মাধ্যমে জিহাদকে ব্যাখ্যা করা যায়

কুরআনের ৩ নম্বর সূরা আল ইমরানের ৬৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ...

"তুমি বল : 'হে কিতাবীগণ! আস সে কথায় যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই,..."

ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলো দূর করার সবচেয়ে ভালো উপায় হল অন্যান্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে একই ধরনের বাণীর উল্লেখ করা। যখনই আমি সেইসব হিন্দুধর্ম অনুসারীদের সাথে কথা বলি যারা ইসলামে জিহাদের সমালোচনা করেন, যে মুহূর্তে আমি মহাভারত ও ভগবদ্‌গীতা থেকে একই ধরনের শ্লোকের উল্লেখ করি এবং যেহেতু তারা মহাভারতের যে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে তার প্রেক্ষাপট জানেন, তারা তৎক্ষণাৎ একমত পোষণ করে বলেন যে কুরআনও যদি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে দ্বন্দ্বের কথা বলে, তাহলে তাতে তাদের কোন আপত্তি নেই বরং তারা কুরআনে যে উদারতা (সূরা তওবার ৬ নম্বর আয়াত) প্রদর্শন করা হয়েছে তার প্রশংসা করেন।

# ১৬

# বেদ ও কুরআনের মধ্যে সাদৃশ্য

বেদে এমন অনেক শ্লোক আছে যার সাথে কুরআনের আয়াতের সাদৃশ্য রয়েছে :

| ইসলাম | হিন্দুধর্ম |
|---|---|
| اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.<br>সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই (সূরা আল ফাতিহা ২ নম্বর আয়াত) | নিশ্চয় মহান সৃষ্টিকর্তার মহিমা বিশাল<br>(ঋগ্বেদ ৫:৮১:১) |
| اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.<br>যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু<br>(সূরা আল ফাতিহা ৩ নম্বর আয়াত) | অসীম দানশীল<br>(ঋগ্বেদ ৩:৩৪:১) |
| اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ.<br>আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর, তাহাদের পথ যাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ দান করিয়াছ, তাহাদের পথ নহে যাহারা ক্রোধে-নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।<br>(সূরা আল ফাতিহা ৬-৭ নম্বর আয়াত) | "আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করো এবং যে পাপ আমাদেরকে বিপথে ধাবিত করে তা থেকে মুক্ত করো" (যজুর্বেদ ৪০:১৬) একই ধরনের কথা আছে ঋগ্বেদ বই ১ মন্ত্র ১৮৯ শ্লোক ১, ২ (ঋগ্বেদ ১:১৮৯:১,২) |
| اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ. فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ. وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ.<br>"তুমি কি দেখিয়াছ তাহাকে, যে দীনকে (ধর্ম) অস্বীকার করে? সে তো | "যখন কোনো ক্ষুধাতুর ব্যক্তি রব করতে করতে উপস্থিত হয় এবং অন্ন ভিক্ষা করে তখন যে অন্নবান হয়েও হৃদয় কঠিন করে রাখে এবং অগ্রে নিজে ভোজন করে, তাকে কেউ কখনো সুখী করে না।" (ঋগ্বেদ ১০:১১৭:২) |

| সে-ই যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়াইয়া দেয় এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না<br>(সূরা মাউন ১-৩ নম্বর আয়াত) | |
|---|---|

## হিন্দুধর্ম ও ইসলামধর্মের শিক্ষার মধ্যে সাদৃশ্য

### ১. মদ্যপান নিষিদ্ধ করা

ক) কুরআনের ৫ নম্বর সূরা মায়িদা ৯০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسَرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর-যাহাতে তোমরাই সফলকাম হইতে পার।"

খ) নিম্নোক্ত স্থানে উল্লেখ আছে-

১) "মনুস্মৃতি অধ্যায় ৯, শ্লোক ২৩৫

"পুরোহিত হত্যাকারী, মদ পানকারী, চোর এবং গুরুর ফুলশয্যা ভঙ্গকারী- এদের সবাই এবং পৃথকভাবে প্রত্যেকে মহাপাপী লোক হিসেবে পরিচিত হওয়া উচিত।"

দুই শ্লোক পরে উল্লেখ আছে:

২) মনুস্মৃতি ৯ শ্লোক ২৩৮

"এসব হীন লোক- যাদের সাথে কারো খাওয়া উচিত নয়, কারোর এদের জন্য আত্মত্যাগ করা উচিত নয়, কারোর এদেরকে পড়ে শোনানো উচিত নয় এবং কারোর এদেরকে বিবাহ করা উচিত নয়- অবশ্যই পৃথিবীতে বেহুদা ঘুরে বেড়াবে সকল ধর্ম থেকে বিচ্যুৎ ও বহিস্কৃত হয়ে।"

৩) একই ধরনের শ্লোক মনুস্মৃতি ১১ নং অধ্যায়ের ৫৫নং শ্লোকে বলা হয়েছে,

"পুরোহিত হত্যা করা, মদপান করা, চুরি করা, গুরুর ফুলশয্যা ভঙ্গ করা এবং যারা এসব কাজ করে তাদের সাথে মেলামেশা করা মহাপাপ।"

৪) মনুস্মৃতি ১১ নং অধ্যায়ের ৯৪ নং শ্লোকে বলা হয়েছে,

"মদ যেহেতু ভাত থেকে নিঙড়ানো অপবিত্র ময়লা এবং ময়লাকে মনে করা হয় অশুভ, সেহেতু পুরোহিত, শাসক ও সাধারণ মানুষের মদ পান করা উচিত নয়।"

গ) নিম্নলিখিত অধ্যায় ও শ্লোকসহ মনু স্মৃতির বেশ কিছু স্থানে মদ্যপান/ নেশা জাতীয় বস্তু নিষিদ্ধ করা হয়েছে :

১. মনুস্মৃতি অধ্যায় ৩ শ্লোক ১৫৯
২. মনুস্মৃতি অধ্যায় ৭ শ্লোক ৪৭-৫০
১. মনুস্মৃতি অধ্যায় ৯ শ্লোক ২২৫
৩. মনুস্মৃতি অধ্যায় ১১ শ্লোক ১৫১
৪. মনুস্মৃতি অধ্যায় ১২ শ্লোক ৪৫
৫. ঋগ্বেদ পুস্তক ৮ স্তবক ২ শ্লোক ১২
৬. ঋগ্বেদ পুস্তক ৮ স্তবক ২১ শ্লোক ১৪

## ২. জুয়া নিষিদ্ধ করা

পবিত্র কুরআনের ৫ নম্বর সূরার ৯০ নম্বর আয়াতে জুয়া খেলাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলা হয়েছে :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর– যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।"

ক. হিন্দুধর্ম গ্রন্থগুলোতেও জুয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে

ঋগ্বেদ পুস্তক ১০ স্তবক ৩৪ শ্লোক ৩:

"একজন জুয়ারি বলে, 'আমার স্ত্রী আমার কাছ থেকে দূরে থাকে, আমার মা আমাকে ঘৃণা করে।' এই হতভাগ্য ব্যক্তি স্বস্তি লাভের জন্য কাউকে পাবে না।"

ঋগ্বেদ পুস্তক ১০:৩৪:১৩ আরো উপদেশ দেয়া হয়েছে–

"পাশা খেলো নাঃ কখনো না, তোমার শস্যক্ষেত চাষ করো। অর্জন উপভোগ করো এবং মনে করো যে সম্পদ যথেষ্ট।"

মনুস্মৃতি ৭ নং অধ্যায় ৫০ নং শ্লোকে বলা হয়েছে–

"মদপান, জুয়া খেলা, নারীর সান্নিধ্য লাভ (আইনসম্মতভাবে যাদের বিবাহ করা হয়নি) এবং শিকার করা– এই ক্রমানুসারে– তার জানা উচিত যে এগুলো হল আকাঙ্ক্ষাজাত পাপের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ চারটি পাপ।"

খ. মনুস্মৃতির বেশ কিছু স্থানে জুয়া খেলাকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে–

১. মনুস্মৃতি অধ্যায় ৭ শ্লোক ৪৭

২. মনুস্মৃতি অধ্যায় ৯ শ্লোক ২২১-২২৮

৩. মনুস্মৃতি অধ্যায় ৯ শ্লোক ২৫৮

## উপসংহার

ইনশাআল্লাহ এই গবেষণা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার বাণীর নিকটবর্তী হতে মানবজাতিকে সাহায্য করবে। এই পুস্তিকায় ব্যাপক এ বিষয়টির সামান্য কিছুই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিছু মানুষকে দশটি নিদর্শন দেখিয়েই উদ্বুদ্ধ করা যায় আবার কিছু মানুষকে একশত নিদর্শন দেখাতে হয়। কাউকে কাউকে হাজার নিদর্শন দেখালেও সত্যকে গ্রহণ করতে চায় না। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ১৮ নম্বর আয়াতে এই ধরনের বদ্ধ-হৃদয়ের মানুষের নিন্দা করে বলা হয়েছে :

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.

"বধির, মূক ও অন্ধ সুতরাং তাহারা ফিরিবে না (সত্য পথে)"

সমস্ত প্রশংসা এক ও অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তা'আলার। তিনিই আত্মনিবেদন, পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ ও ইবাদত লাভের যোগ্য। আমি মুনাজাত করি এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আল্লাহর দরবারে কবুল হোক, যাঁর নিকট আমি রহমত ও হেদায়াত প্রার্থনা করি (আমীন)।

বাংলায় প্রকাশিত

ডা. জাকির নায়েকের

অন্যান্য বই-

১. বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব

২. কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান : সংগতিপূর্ণ না সংগতিহীন

৩. বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ্ সম্পর্কে ধারণা

৪. ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের প্রশ্নের জবাবে ডা. জাকির নায়েক

৫. বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আল কুরআন ও বাইবেল

৬. ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে মিল ও সাদৃশ্য

৭. কুরআন কি আল্লাহর বাণী?

## রিসার্চ ফাউন্ডেশন পরিবেশিত গ্রন্থসমূহ

বাংলা

- অলৌকিক কিতাব আল-কুরআন- আহমেদ দিদাত, অনুবাদ : *এ কে মোহাম্মদ আলী*
- ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের প্রশ্নের জবাবে ডা. জাকির নায়েক- অনুবাদ : *এম.জি. কিবরিয়া*
- বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব- মূল : ডা. জাকির নায়েক, অনুবাদ : *মুহাম্মদ মাহবুব কায়সার*
- বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আল-কুরআন ও বাইবেল
  মূল : *ডা. জাকির নায়েক, অনুবাদ : শফিকুল ইসলাম মাসুদ*
- বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা- *ডা. জাকির নায়েক, অনুবাদ : মোঃ মনিরুল ইসলাম*
- কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান : সংগতিপূর্ণ না সংগতিহীন
  *ডা. জাকির নায়েক, অনুবাদ : এন.আই. মল্লিক*
- ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে মিল ও সাদৃশ্য : *ডা. জাকির নায়েক, অনুবাদ : ইফফাত আরা চৌধুরী*

**মুহাম্মাদ আনওয়ার হুসাইন রচিত- ড. এস.এম আজহারুল ইসলাম সম্পাদিত**

- **আল কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ-**
  - সিরিজ- (১) কুরআন, সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিগব্যাংগ
  - সিরিজ- (২) কুরআন, কিয়ামাত ও পরকাল
  - সিরিজ- (৩) কুরআন, মহাবিশ্ব ও মূলতত্ত্ব
  - সিরিজ- (৪) কুরআন, মহাবিশ্ব ও মহাধ্বংস
  - সিরিজ- (৫) কুরআন, কোয়াসার ও শিংগায় ফুৎকার
- আদমের আদি উৎস- *আল মেহেদী*
- সৃষ্টি ও স্রষ্টার রহস্য- *আল মেহেদী*
- বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান- *মুহাম্মদ নূরুল আমীন*
- মহাকাশ গাইড- *মুহাম্মাদ আনওয়ার হুসাইন*
- মানুষ ও ভিনগ্রহী সভ্যতা: যার উত্তর বিজ্ঞানীরা আজও খুঁজে পাননি- *এম. আজিজুল হক*

ইংরেজী

- Towards Understanding Islam - *S A A Maudoodi*
- Fundamentals of Islam - *S A A Maudoodi*
- Nations rise and fall why - *S A A Maudoodi*
- The Quran & Modern Science : Compatible or incompatible - *Dr. Zakir Naik*
- The Quran & The Bible in the light of Science - *Dr. Zakir Naik*
- Concept of God in Major Religions - *Dr. Zakir Naik*
- Universal Brotherhood - *Dr. Zakir Naik*
- Answers to Non-Muslims Common Questions about Islam - *Dr. Zakir Naik*
- Is non-vegetarian food permitted or prohibited- *Dr. Zakir Naik*
- Is the Quran God's word - *Dr. Zakir Naik*
- Similarities Between Hinduism and Islam - *Dr. Zakir Naik*

**THE RESEARCH FOUNDATION FOR QURAN & SCIENCE**
দি রিসার্চ ফাউন্ডেশন ফর কুরআন এন্ড সাইন্স
২৪৬ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫, ফোন ঃ ০১৯১১ ০১২৯৭৬